দাম : ষোলো টাকা

# স্বস্তিকা

দেশের উন্নয়নের জন্য
'এক দেশ এক ভোট' জরুরি
— পৃঃ ২৩

'এক দেশ এক নির্বাচন' ব্যবস্থা
ফিরিয়ে আনা অসম্ভব নয়
— পৃঃ ১১

৭৭ বর্ষ, ১০ সংখ্যা।। ১১ নভেম্বর, ২০২৪।। ২৫ কার্তিক, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

# এক দেশ এক ভোট

## নতুন ভারত গঠনে আরও একধাপ উত্তরণ

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555

E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

# স্বস্তিকা

*।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।*

৭৭ বর্ষ ১০ সংখ্যা, ২৫ কার্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
১১ নভেম্বর - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৬,
Website : www.eswastika.com

**সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা**
**সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল**
**প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**

দূরভাষ :
**সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)**
**সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫**
**সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪**

**বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩**
**দাম : ১৬ টাকা**
**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।**

**Postal Registration No.-** KOL RMS/048/2022-2024
R N I No. 5257/1957
দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

*ফঃ ১*


# সূচীপত্র


সম্পাদকীয় ◻ ৫

**সিপিএম-তৃণমূলের 'সংকর' জোট অভয়ার বিচার আটকে দেবে? :**

**পুনর্মূষিকো ভব...** ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

**ও দিদি পায়ে পড়ি রে...** ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

**ভারতীয় নৃত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান এবং তৎকালীন মহিলাদের মঞ্চ প্রবেশ** ◻ বৈশাখী কুণ্ডু ◻ ৮

**কানাডায় আক্রান্ত ভারতীয়রা** ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

**'এক দেশ এক নির্বাচন' ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা অসম্ভব নয়** ◻ ধর্মানন্দ দেব ◻ ১১

**ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা: পশ্চিমবঙ্গটা আফগানিস্তান, পাকিস্তান বা বাংলাদেশ না হয়ে উঠুক** ◻ বরুণ মণ্ডল ◻ ১৪

**ভারত এবং হিন্দু বিদ্বেষে ভাসছে বাংলাদেশ** ◻ রঞ্জন কুমার দে ◻ ১৬

**'এক দেশ—এক নির্বাচন' ব্যবস্থায় কমবে হয়রানি, হবে অর্থের সাশ্রয়** ◻ অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় ◻ ১৮

**দেশের উন্নয়নের জন্য 'এক দেশ এক ভোট' জরুরি** ◻ আনন্দ মোহন দাস ◻ ২৩

**'একদেশ এক ভোট' নতুন ভারত গঠনে আরও একধাপ উত্তরণ** ◻ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ◻ ২৫

**নির্বাচনী ডাকটিকিট** ◻ সৈকত চট্টোপাধ্যায় ◻ ২৯

**বঙ্গদেশে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজার আখ্যান** ◻ গোপাল চক্রবর্তী ◻ ৩১

**বউবাজার 'নৃত্য ভবন'-এর ঐতিহ্যমণ্ডিত জগদ্ধাত্রী পূজা** ◻ সপ্তর্ষি ঘোষ ◻ ৩২

**মা সারদার জগদ্ধাত্রী পূজা** ◻ মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কল্যাণ চক্রবর্তী ◻ ৩৩

**একাত্ম মানবদর্শন—বিজ্ঞানসম্মত একটি দর্শন** ◻ ডাঃ সুভাষ সরকার ◻ ৩৬

**পশ্চিমবঙ্গে নারী নির্যাতনের ধারাবাহিকতা** ◻ দেবযানী ভট্টাচার্য্য ◻ ৪৩

**অখণ্ড ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী : নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু** ◻ প্রণব দত্ত মজুমদার ◻ ৪৮

**নিয়মিত বিভাগ :**

**◻ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ৩০ ◻ রঙ্গম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১**

প্রকাশিত হবে ১৮ নভেম্বর, ২০২৪

# স্বস্তিকা

## আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ১৮ নভেম্বর, ২০২৪

## শিখপন্থ হিন্দুধর্মেরই অঙ্গ

ভারত জননীর বীর সন্তানেরা যুগে যুগে আবির্ভূত হয়ে এই দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করেছেন, দেশের যশ ও সম্মান বৃদ্ধি ঘটিয়েছেন, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন। সমাজ সংস্কারকের পাশাপাশি ধর্ম সংস্কারকরাও আবির্ভূত হয়েছেন এই দেশে। ভারতবর্ষের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশে পঞ্জাব প্রদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন এমনই একজন গুরু নানকদেব। তিনি শিখপন্থের প্রতিষ্ঠাতাও। ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক পবিত্রতা রক্ষায় তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। শিখপন্থ হিন্দুধর্মেরই একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরম্পরা।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়ে আলোকপাত করবেন ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, রবিরঞ্জন সেন, রাজদীপ মিশ্র, শিবাজী প্রসাদ মণ্ডল, সোমকান্তি দাস প্রমুখ।

## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
**SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

**INDIAN OVERSEAS BANK**

Branch : **Sreemani Market**

**Kolkata-700 006**

## একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

**সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—**

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693

IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

# সম্পাদকীয়

## এক দেশ এক নির্বাচনী প্রক্রিয়া

এই বৎসর লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে মার্চ মাসে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বাধীন উচ্চ পর্যায়ের কমিটির দ্বারা সযত্নে প্রস্তুত 'এক দেশ এক নির্বাচনী প্রক্রিয়া'র সুপারিশ দেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতির নিকট জমা পড়িবার পর হইতেই ভারতের জনগণ আশায় বুক বাঁধিতেছেন যে অচিরেই এই ব্যবস্থা কার্যকর হইয়া তাঁহাদিগকে ভোট-যন্ত্রণার হাত হইতে রেহাই প্রদান করিবে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 'ভোট-যন্ত্রণা' শব্দবন্ধটি বিসদৃশ লাগিলেও বর্তমান পঙ্কিলময় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ইহাই কটুসত্য। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, দেশের স্বাধীনতার পরে যখন দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ এতটা বিষাক্ত হয় নাই, তখনও এক দেশ-এক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু ছিল। ১৯৫১ সনের শেষ হইতে ১৯৬৭ পর্যন্ত দেশের লোকসভা এবং সমস্ত বিধানসভার ভোট একত্রে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু গোল বাঁধিলো ১৯৬৭-তেই। কংগ্রেস সেই যাত্রায় বহু বৃহৎ রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। ক্ষমতা ধরিয়া রাখিতে তাহাদের শরিক রাজনৈতিক দলের অনুসন্ধান করিতে হয়, অনেক রাজ্যেই তাহারা ক্ষমতাচ্যুত হয়। বলা বাহুল্য, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনালগ্নে কংগ্রেস নামক সার্বজনীন মঞ্চের সুযোগ লইয়া স্বাধীনতার পরও জওহরলাল নেহরুর পরিবারের যে একাধিপত্য সৃষ্টি হইয়াছিল, তাঁহার কন্যা ইন্দিরা গান্ধীর আমলেই ১৯৬৭ সনে রাজ্যে রাজ্যে তাহা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। পুনরায় একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭০-এ লোকসভা ভাঙিয়া অকাল নির্বাচনের পথে যান। ফলত, 'এক দেশ-এক নির্বাচন'-এর চক্রটি ভাঙিয়া যায় এবং লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনসমূহ পৃথক পৃথক কালপর্বে হইতে থাকে। এই ব্যবস্থা পুনরায় দেশব্যাপী বলবৎ হইলে দেশীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলসমূহ সম্পূর্ণরূপে 'অপ্রাসঙ্গিক' হইয়া পড়িবার আশঙ্কা করিতেছে। দেশের বিরোধী দলসমূহ মূলত একনায়কতন্ত্রের জুজু দেখাইয়া দেশবাসীকে এক দেশ এক নির্বাচনী প্রক্রিয়া হইতে বিরত করিতে মনস্থির করিয়াছে। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে— এক দেশ এক নির্বাচনী ব্যবস্থা তুলিয়া দিবার পরই ইন্দিরা গান্ধী স্বেচ্ছাচারী হইয়াছিলেন। যাহার দরুন, জরুরি অবস্থার মতো বর্বরোচিত ঘটনার সাক্ষী থাকিয়াছিল ভারত। তাহার উপরে তৃতীয়বার নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসিলেও এইবার এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় তাহাদের বিরুদ্ধে একনায়কতন্ত্রের অভিযোগ ধোপে টিকিবে না।

এখন প্রশ্ন হইল, দেশের স্বাধীনতার পর যাহা ছিল স্বাভাবিক ঘটনা, সেই এক দেশ-এক নির্বাচনী প্রক্রিয়া পুনরায় প্রত্যাবর্তন করাইবার কী প্রয়োজন পড়িল? প্রথমত, অন্যান্য প্রয়োজন অপেক্ষা আর্থিক প্রয়োজনটিই এখন সর্বাপেক্ষা বড়ো হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতের ন্যায় একটি উন্নয়নশীল দেশে নির্বাচনকে উপলক্ষ্য করিয়া বিপুল ব্যয়ে লাগাম টানিলে যে আখেরে দেশের অর্থনীতিরই উপকার হইবে, তাহা অনুধাবন করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। বৎসরে একাধিকবার পৃথক পৃথক সময়ে অথবা প্রতি বৎসর নির্বাচন করা হইতে বিরত হইয়া পাঁচ বৎসর অন্তর একবার সামগ্রিকভাবে নির্বাচন আয়োজিত হইলে যে বর্তমান নির্বাচনী ব্যবস্থার তুলনায় আর্থিক ব্যয় বহুলাংশে বাঁচিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। কোবিন্দ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী, মেয়াদ শেষের পূর্বেই কোনো সরকারের পতন ঘটিলে পুনরায় নির্বাচন হইবে, কিন্তু সেই সরকার কেবল অন্তর্বর্তী সময়টুকুর জন্য নির্বাচিত হইবে। ফলত, মাঝপথে সরকার ফেলিয়া দিবার প্রবণতা হ্রাস পাইবে, নির্বাচনের অনাবশ্যক ব্যয়ের ঝুঁকি কমিবে। এই উদ্বৃত্ত অর্থ দেশের উন্নতির কাজে লাগিবে। দ্বিতীয়ত, জাতীয়তাবোধের প্রশ্নটিও এক্ষেত্রে গভীরভাবে জড়িত। এক দেশ, এক বিধান, এক প্রধান, সর্বোপরি এক নিশানের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাইবার পর সমগ্র দেশে একইসঙ্গে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে, ইহা ভারতীয়দিগকে 'এক জাতি এক প্রাণ' হইয়া উঠিতে প্রেরণা জোগাইবে। বহু নাগরিক জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে রাজ্যের ও দেশের বাহিরে বসবাস করেন। বারংবার নির্বাচন সংঘটিত হইলে তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে সমস্যার সম্মুখীন হইয়া থাকেন। বহু মানুষ এই কারণে ভোটদানের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হন। পাঁচ বছর অন্তর ভোটগ্রহণ হইলে ব্যাপক সংখ্যক প্রবাসী ভারতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন। ইহাতে নিশ্চিতভাবে ভোটদানের হার-বৃদ্ধি ঘটিবে, নির্বাচন সম্পর্কে মানুষের অনীহা প্রশমিত হইবে। 'শক্তিশালী গণতন্ত্র' হইয়া উঠিবার লক্ষ্যে ভারতের আরও একটি পদক্ষেপ হইবে 'এক দেশ-এক নির্বাচন'।

কিন্তু 'এক দেশ এক নির্বাচনী প্রক্রিয়া' সম্পর্কে কতিপয় সাংবিধানিক জটিলতার বিষয়টিও মাথায় রাখিতে হইবে। সংবিধানের অন্তত ১৮টি স্থানে সংশোধন করিতে হইবে। কাজটি যে সহজ হইবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। এক দেশ-এক নির্বাচনের পথে অগ্রসর হইলে হয় অনেকগুলি বিধানসভার মেয়াদ শেষের পূর্বেই ভাঙিয়া দিতে হইবে, নতুবা মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া লোকসভা নির্বাচনের সময় পর্যন্ত অপেক্ষমান থাকিতে হইবে। এখনও পর্যন্ত এক দেশ-এক নির্বাচন ব্যবস্থা আলাপ-আলোচনার স্তরেই রহিয়াছে। বিধিবদ্ধভাবে তাহা বলবৎ করিতে হইলে কেন্দ্রীয় সরকারকে সংসদে প্রয়োজনীয় সংবিধান-সংশোধনী বিল আনিতে হইবে। সেই বিল লোকসভা, রাজ্যসভা-সহ ১৫টি রাজ্য বিধানসভা কর্তৃক অনুমোদিত হইলে তা আইন হিসাবে স্বীকৃত হইবে। প্রশ্ন উঠিবে, বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতাসীন বেশ কিছু আঞ্চলিক দল এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস-সহ আরও কিছু দলের সমর্থন ব্যতীত আদৌ 'এক দেশ-এক নির্বাচন'-এর ন্যায় অতীব প্রয়োজনীয়, গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার বাস্তবায়ন সম্ভব হইবে কিনা, সেইদিকেই দেশবাসী অধীর আগ্রহে তাকাইয়া থাকিবে।

### সুভাষিতম্

**শ্রদ্ধা ত্যাগস্তপো যত্নঃ সমতা শুদ্ধশীলতা।**
**ইত্যেতৎ সঙ্ঘযোগস্য বিজ্ঞাতব্যং ষড়ঙ্গকম্।।**
শ্রদ্ধা, ত্যাগ, তপস্যা, পরিশ্রম, সমভাব এবং শুদ্ধ চরিত্র— এগুলি সঙ্ঘযোগের ছ'টি অঙ্গ।

## সিপিএম-তৃণমূলের ‘সংকর’ জোট অভয়ার বিচার আটকে দেবে?

# পুনর্মূষিকো ভব...

**নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়**

তৃণমূল এখন সিপিএম নির্ভর। তথ্য তাই বলে। ১৯৯৮ সালে রাজ্য রাজনীতিতে ভুঁইফোঁড় হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কংগ্রেস নেতারা তাই বলত। জন্মেছিল তৃণমূল। ছাব্বিশ বছর পর পুনরাবৃত্তি করছেন মমতা। ‘মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল’ (১৯৩৫) নাটকে টিএস এলিয়ট বুঝিয়েছিলেন হুতাত্মার বিরুদ্ধে লড়তে হুতাত্মা প্রয়োজন। কৃত্রিম আর অকৃত্রিম ভুঁইফোঁড়। অভয়ার বিচার আন্দোলনের ৭৫ দিনের মাথায় জুনিয়র ডাক্তার ফ্রন্টের পালটা একটি ভুঁইফোঁড় অ্যাসোসিয়েশন গজিয়ে উঠেছে। তৃণমূলের ফেসবুক পেজ তা সদম্ভে ঘোষণা করেছে। মমতার বার্তা— অভয়ার বিচারের আন্দোলনের পদ্ধতি ভুল। ১৯৮৩ সালে ডাক্তার পিটিয়ে জ্যোতি বসুকে নতজানু হতে হয়েছিল।

গত ১৪ আগস্টের রাত দখলের সময় আরজি করে হামলা দিয়ে তার পুনরাবৃত্তি ঘটে। সিপিএম আর তৃণমূল একই মুদ্রার দু'পিঠ। মানুষকে বোঝাতে বিজেপিকে বেগ পেতে হবে। কেবল ছিপিমূলের চটুল ব্যাখ্যা দিয়ে লাভ হবে না। এ রাজ্যে এখনও বিজেপি প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতি শুরু করেনি। রাজ্যে বহুমুখী দল হিসেবে তারা গড়ে ওঠার চেষ্টা করে চলেছে। ১৯৭৭ সালে সিপিএম প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতি শুরু করে। গ্রাম, জেলা, ব্লক, টাউন বা শহরের প্রতিষ্ঠানে বিজেপির উপস্থিতি এখনও শক্ত নয়। ফলে চিকিৎসকদের আন্দোলনকে সমর্থন করতে বিজেপিকে মানুষের উপরেই নির্ভর করতে হয়েছে। বিজেপির বয়স ৪৪। তৃণমূলের ২৬। তেরো বছর আগে তৃণমূল প্রাপ্তবয়স্ক হয়। এ রাজ্যে বিজেপির উত্থান পাঁচ বছর আগে ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে।

তাই বিজেপির প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতি করার সময় পেরিয়ে যায়নি। তারপরেও বিজেপি পরপর তিনবার প্রায় ৪০ শতাংশ করে ভোট পেয়েছে। বিজেপির অগ্রগতি একেবারে মমতা বিরোধী মানুষ-নির্ভর। প্রতিষ্ঠান নির্ভর নয়। সে ভোট সুসংহত রাখা অবশ্যই কৃতিত্বের। রাজ্য থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া সিপিএম এখন বিশ্বাস করে মার্কসবাদ সর্বশক্তিমান কারণ তা সত্য। তা প্রমাণ করতে ৩৪ বছর ধরে তারা বহুবার লাঠি আর গুলি চালিয়েছে। মানুষ মেরেছে। তাতে মমতার ভিত শক্ত হয়েছে। চিকিৎসকরা ‘টেকনোক্র্যাট’। কর্মকুশলতার যোগ্যতায় তারা মানুষের বিশ্বাস আর সমর্থন পেয়েছে। তবে অভয়ার বিচার আন্দোলনে কিছু বামপন্থী ঢুকে যাওয়ায় তার কৌশলগত রাজনৈতিক ফয়দা পেয়েছেন মমতা। প্রাকৃতিকভাবে না হলেও রাজনৈতিকভাবে তেলে আর জলে মেশে।

সিপিএম আর তৃণমূলের ‘সংকর’ জোট তার প্রমাণ। তাই অনেকেই বোদ্ধার মতো বলছেন অভয়ার বিচার চেয়ে ডাক্তারদের আন্দোলন শেষের মুখে। কারণ এটা ধরে নেওয়াই হচ্ছে যে ডাক্তারদের এই আন্দোলনের মুখ বামপন্থীরা। আর তাদের গলাধঃকরণ করেছেন মমতা। ফলে ডাক্তাররা হয়েছেন পুনর্মূষিক। অনশন আর কর্মবিরতি তুলে নেওয়ার পর এই ধারণা আরও জোরদার হয়েছে। অভয়ার আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যেতে ইতিমধ্যেই ৮০টি সামাজিক সংস্থা একত্রিত হয়েছে, অনেকের নজর তা এড়িয়ে গিয়েছে। তারা সহজে হাল ছেড়ে দেবে না। বিজেপিকে ফ্যাসিবাদী বা দাঙ্গাকারী দল ব্যাখ্যা করে চিকিৎসক আন্দোলন থেকে তাদের সরিয়ে রাখার রাজনীতি যে আখেরে মমতার সুবিধা করে দেওয়া তা সিপিএম জানে। ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে তৃণমূল থেকে বিজেপিতে ১৩৬ জনকে নিয়ে ভোটপর্বে হোঁচট খেয়েছিল বিজেপি। সেই সূত্র ধরে সিপিএম এবার মমতার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধছে।

তবে চিকিৎসকদের আন্দোলন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার করেছে সিপিএমের প্রধান শত্রু কিন্তু বিজেপি। তৃণমূল নয়। তবে এটাও ঠিক যে তৃণমূল আর সিপিএমের একত্র অপপ্রচারের মোকাবিলা করতে বিজেপিকে গ্রামের ভোটারদের কাছে টানার পারদর্শিতা দেখাতে হবে। লক্ষ্য করার যে তৃণমূল আর সিপিএম প্রায় একসুরে ‘রা’ ধরেছে যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা অভয়ার বাবা-মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে বা আরজি কর কাণ্ড নিয়ে প্রায় কিছু না বলে নৈতিক দায়িত্ব পালন করেননি। তাই বিজেপি নাকি এই আন্দোলনের কেউ নয়। সিপিএম বলছে মমতা যেমন বিচার চায় না বিজেপিও চায় না। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর কথা দিয়েই বলি ‘আব কি বারি অটলবিহারী। আগলিবারি অটলবিহারী। দু'টো বেড়াল আবার দইয়ের হাঁড়ি টার্গেট করেছে। কিন্তু বুঝছে না যে এবার হাঁড়িটাই নেই’। ছিপিমূলের গোপন জোট প্রকাশ্যে আসার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হলে দুই দলেরই মুখোশ খুলে পড়বে। রাজ্যজুড়ে রাষ্ট্রবাদীদের উত্থান অবশ্যম্ভাবী। তাই পুনর্মূষিক হওয়ার সম্ভাবনাও ক্ষীণ।

*(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)*

> **বিজেপিকে ফ্যাসিবাদী বা দাঙ্গাকারী দল ব্যাখ্যা করে চিকিৎসক আন্দোলন থেকে তাদের সরিয়ে রাখার রাজনীতি যে আখেরে মমতার সুবিধা করে দেওয়া তা সিপিএম জানে।**

# ও দিদি পায়ে পড়ি রে...

নির্বিকারেষু দিদি,

আপনি বেশ আছেন কিন্তু। রাজ্যের দুর্গাপূজা, বাড়ির কালীপূজা, দলের ভাইফোঁটা নিয়ে আনন্দেই আছেন আশা করি। কিন্তু রাজ্যের কী অবস্থা? তিনটি ঘটনার কথা বলি। এগুলো একেবারেই উদাহরণ মাত্র। এ সব দেখেই আমার আব্দার, ও দিদি পায়ে পড়ি রে, রাজ্যটায় একটু শান্তি এনে...।

প্রথমটি শিলিগুড়ির। তোলাবাজির টাকা না দেওয়ায় প্রৌঢ়কে খুনের অভিযোগ শিলিগুড়ির ৩৫ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়। মারধর করা হয় তাঁর মেয়েকেও। মৃত ব্যক্তির নাম মহম্মদ জহুরি। পরিবারের দাবি, রাতে জহুরি বাড়ির সামনে একটি জায়গায় বসেছিলেন। সেই সময় এলাকারই কয়েকজন জন যুবক তাঁর কাছে টাকা চান। কেন হঠাৎ ৫০০ টাকা দিতে যাবেন, প্রশ্ন করেন প্রৌঢ়। অভিযোগ, তার পরেই তাঁকে লাথি, ঘুষি মারা হয়। মায়ের চোটে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন প্রৌঢ়। চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন জহুরির মেয়ে। বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে তিনিও প্রহৃত হন।

মৃতের ছেলে সেলিমের দাবি, তোলাবাজির প্রতিবাদ করায় তাঁর বাবাকে খুন করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের এলাকায় তোলাবাজি চালাচ্ছে এলাকারই বেশ কিছু যুবক। স্থানীয় কাউন্সিলর এবং পুলিশকে বার বার এই বিষয়টা জানানো হয়েছে। কিন্তু কেউ কোনও ব্যবস্থা নেননি।' তিনি জানান, শুক্রবার রাতে তাঁর বাবার কাছে ৫০০ টাকা চান কয়েকজন যুবক। কেন টাকা দেবেন, প্রশ্ন করতেই শুরু হয় মারধর। আচ্ছা, আপনার ভাইয়েরা এতে নেই তা কি হতে পারে! তৃণমূল ছাড়া অন্য কেউ করলে রক্ষা থাকত?

পরের ঘটনা শান্তিপুরের। কালীপূজার শোভাযাত্রায় এক বধূর গায়ে কুলকুচি করে মদ ছেটানোর অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা। মহিলার স্বামীকেও বেধড়ক মারধর করা হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, শান্তিপুর রেলস্টেশন এবং গোডাউন মাঠের দিক থেকে পর পর তিনটি শোভাযাত্রা যাচ্ছিল কাশ্যপপাড়ার দিকে। ওই শোভাযাত্রা থেকে এক মহিলার সঙ্গে অভব্যতার অভিযোগে ওঠে কয়েকজন যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, মহিলার গায়ে কুলকুচি করে ছেটানো হয় মদ। ওই বধূ প্রতিবাদ করায় পালটা তাঁর মুখে কুলকুচি করে মদ ছেটানো হয় বলে অভিযোগ। স্ত্রীর অসম্মানের প্রতিবাদ করেন স্বামী। তখন মদের বোতল ভেঙে তাঁকে আক্রমণ করা হয়। স্বামী-স্ত্রী, দু'জনকেই রাস্তায় ফেলে মারধর করা হয়।

এবার হুগলির মগরা। এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে প্রতিবেশী যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্যাতিতার বয়স ১৬ বছর। অভিযোগ, মগরা থানা এলাকায় তাঁর বাড়িতে ঢুকে যৌন নির্যাতন করেছেন প্রতিবেশী যুবক। ওই মর্মে মগরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে নির্যাতিতার পরিবার। ওই অভিযোগের প্রেক্ষিতে যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আর বিস্তারিত বলছি না। লজ্জা লাগছে। প্রতিদিনই রাজ্যের কোথাও না কোথাও এই ধরনের ঘটনা ঘটেই চলেছে অবিরাম।

> মহিলার গায়ে কুলকুচি করে ছেটানো হয় মদ। ওই বধূ প্রতিবাদ করায় পালটা তাঁর মুখে কুলকুচি করে মদ ছেটানো হয় বলে অভিযোগ। স্ত্রীর অসম্মানের প্রতিবাদ করেন স্বামী। তখন মদের বোতল ভেঙে তাঁকে আক্রমণ করা হয়।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে আপনার পদত্যাগের দাবি আগেই উঠেছে। সে দাবি রয়েছে। কিন্তু দিদি, আপনি তো পুলিশমন্ত্রীও। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক কেমন ঠাওর করতে পারছেন কি! সবেতেই আপনার দলের লোকেরা যে জড়িত তা আমি বলছি না। তবে প্রশ্রয় রয়েছে এটা একশো ভাগ সত্যি। দলের মধ্যেই কি কম মারামারি!

নদীয়ার ভীমপুরের ঘটনাটা জানেন তো? ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। এক ব্যক্তি প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন, হুমকি দিচ্ছেন অন্য এক জনকে। তৃণমূলের লোকেরাই বলছেন, যে ব্যক্তির হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দেখা গিয়েছে, তাঁর নাম হিরণ বিশ্বাস। নদিয়ার ভীমপুর থানা এলাকার বাসিন্দা হিরণ তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী। তিনি আর এক তৃণমূল কর্মীকে হুমকি দেন বলে অভিযোগ। ওই তৃণমূল কর্মীর দাবি, তোলাবাজি এবং জুলুমে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি হিরণের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছিলেন। কিন্তু পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল। তাই তিনি প্রাণের ভয়ে এখন বাড়ি ছেড়ে অন্য এক জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন। তৃণমূল কর্মীরা এও বলছেন যে, হিরণ স্থানীয় তৃণমূল অঞ্চল সভাপতির ঘনিষ্ঠ বলেই তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না পুলিশ।

ভাবা যায়, দিদি ভাবা যায়! □

# ভারতীয় নৃত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান এবং তৎকালীন মহিলাদের মঞ্চ প্রবেশ

বৈশাখী কুণ্ডু

নৃত্যের সংজ্ঞায় বিশ্বকবি বলেছেন, 'আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভার, আর তাকে চালনা করে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গতিবেগ। এই দুই বিপরীত পদার্থ যখন পরস্পরের মিলনে লীলায়িত হয় তখন জাগে নাচ। দেহের ভারটাকে দেহের গতি নানা ভঙ্গীতে বিচিত্র করে— জীবিকার প্রয়োজনে নয়— সৃষ্টির অভিপ্রায়ে, দেহটাকে দেয় চলমান শিল্পরূপ। তাকে বলি নৃত্য।'

আধুনিক ভারতে রবীন্দ্রনাথই প্রথম সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্র তথা শিক্ষায়তন— 'বিশ্বভারতী' (বিশ্ব + ভারতী = পৃথিবীর সরস্বতী বা বিশ্বমুখীনতা) প্রতিষ্ঠা করেন ১৯২১ সালের ২৩ ডিসেম্বর। কবিগুরুকে দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৩০ সালে ভাল্লাখোল নারায়ণন মেনন কেরালা কলামণ্ডলম কথাকলি চর্চাকেন্দ্র এবং ১৯৩৬ সালে রুক্মিণীদেবী অরুন্ডেলে কলাক্ষেত্র ভরতনাট্যম চর্চাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কলকাতায় বাবুসংস্কৃতির উদ্ভব এবং দেশীয় সংস্কৃতির অবনমন ঘটে। সেসময় নৃত্যকলা চটুল বিনোদনের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। ফলত শিক্ষিত সমাজ নৃত্যকে নীচু চোখে দেখত। এই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অনুভব করেন আমাদের দেশের পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে জ্ঞানচর্চার সীমা খুবই সংকীর্ণ। তাই চিত্তের পূর্ণ বিকাশের জন্য সকল রকমের সংস্কৃতিচর্চা যেমন— কারুকার্য, শিল্পকলা, নৃত্যগীতবাদ্য, নাট্যাভিনয় ইত্যাদি চর্চার প্রয়োজন। তিনি নিজে নৃত্যশিল্পী ছিলেন না। তিনি ছিলেন সুন্দরের পূজারী। সারা বিশ্ব ভ্রমণ করে যেখানে যা কিছু ভালো দেখেছেন, নিয়ে এসেছেন বিশ্বভারতীয় ছেলে-মেয়েদের শেখাবার জন্য। তাঁর অনুপ্রেরণাতে বেশ কয়েকটি শাস্ত্রীয় ও লোকনৃত্য এবং কয়েকটি বিদেশি নৃত্য শেখার সুযোগ পেয়েছিল তখনকার ছাত্র ছাত্রীরা। গ্রামীণ নৃত্য প্রসঙ্গে জানা যায় যে, বাউল, রায়বেঁশে, জারি, ময়ূরভঞ্জের ছৌ ইত্যাদি বঙ্গের জনপ্রিয় এই লোকনৃত্যগুলি শান্তিদেব ঘোষ পর্যবেক্ষণ করে গুরুদেবের গানের সঙ্গে নৃত্যরূপ দিয়েছিলেন। যেমন বাউল আঙ্গিকে 'এ বেলা ডাক পড়েছে', 'ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়' গানটির সঙ্গে একতারা হাতে রায়বেঁশে ও জারি গানের সঙ্গেও নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন।

সৌরাষ্ট্রের মন্দিরানৃত্য-কুশলী একটি পরিবার গুরুদেবের আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনে এসে দুহাতে দুজোড়া মন্দিরা বাজিয়ে গানের সঙ্গে মাটিতে বসে সুন্দর অঙ্গভঙ্গিতে নৃত্য পরিবেশ করেছিল। তাই দেখে গুরুদেব রচনা করলেন, 'দুইহাতে কালের মন্দিরা যে' এবং আচার্য নন্দলাল বসুর ক্যানভাসে ফুটে উঠেছিল আম্রকুঞ্জের মাঝে বসে একটি কিশোরী কন্যার দুই হাতে মন্দিরা বাজিয়ে নৃত্য। শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন নৃত্যানুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদেশি নৃত্যের প্রয়োগ দেখা গেছে। স্বল্প কয়েকটি উদাহরণ : 'মানময়ী' নাটকে 'আয় তবে সহচরী' গানটির সঙ্গে বিলিতি আঙ্গিকে হাতে হাত মিলিয়ে নৃত্য পরিবেশিত হয়েছিল। আবার বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানে গুরুদেবের নির্দেশে প্রতিমা দেবী ইউরোপীয় আধুনিক নাচের আঙ্গিকে 'এসো নীপবনে' গানটির সঙ্গে নৃত্য করেছিলেন। হাঙ্গেরির ছাত্রী শ্রীমতি ব্রুণার 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে' গানটির সঙ্গে নিজস্ব ভঙ্গীতে নাচেন। এছাড়াও রুশদেশীয়, জাপানী নৃত্য, 'ক্যান্ডিনাচ', রেঙ্গুনের 'রামপোয়ে' ইত্যাদি ভিন্ন আঙ্গিকের নৃত্য সমাবেশ ঘটেছিল শান্তিনিকেতনে। আবার সেই সময়ে স্বীকৃতি প্রাপ্ত কিছু শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রয়োগও গুরুদেব করেছেন। কবির উদ্যোগে মণিপুরী ও কথাকলি নৃত্য শাস্ত্রীয় নৃত্যের স্বীকৃতি পায়। গীতিনাট্যের নৃত্যনাট্যে রূপান্তর এবং ভিন্ন ধারার নৃত্যশৈলীর সমাবেশ গুরুদেবের এক অভিনব পদক্ষেপ। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, শান্তিনিকেতনের নৃত্যে বিভিন্ন দেশি ও বিদেশি নৃত্যের সংমিশ্রণ ঘটেছে কিন্তু কারো সঙ্গে কারোর কোনো বিরোধ নেই। নৃত্যশৈলীগুলিকে এককভাবে বিশ্লেষণ করলে কিন্তু রবীন্দ্র নৃত্যকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। দক্ষিণ ভারতের নৃত্যে রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নৃত্যে দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যের প্রয়োগ দেখা যাবে।

এ এক অদ্ভুত মিশ্রণ। গুরুদেব তাঁর নৃত্যে বা বিভিন্ন নৃত্য নাট্যগুলির আহার্য অভিনয় এবং মঞ্চসজ্জাতেও অভিনব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। সেই সময়ে মহিলাদের ক্ষেত্রে মঞ্চে নৃত্য পরিবেশন খুবই মুশকিল ছিল। কারণ ব্রিটিশ রাজত্বে যুব সমাজে বাবু শ্রেণীর উদ্ভব হয়। দেশীয় সংস্কৃতির অবহেলা প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে যায়। যে নৃত্যকলা জনসমক্ষে পরিবেশিত হতো তা অন্ধকার কোণে চলে যায়। চটুল হয়ে ওঠে বাঈজী শ্রেণীর নৃত্য। ফলত ভদ্র সমাজ নৃত্যকলার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু কবির ঐকান্তিক চেষ্টায় আজ শিক্ষিত এবং ভদ্র পরিবেশের মহিলারা মঞ্চে নৃত্য পরিবেশনের সুযোগ পেয়েছে। এই নিবন্ধে কবিগুরুর সময় এবং উত্তর পর্বে মহিলাদের নৃত্যচর্চা বিষয়ে দু-চারকথা আলোচিত হলো— শান্তিনিকেতনে নৃত্যশিক্ষা এবং পরিবেশনায় কবির স্নেহের মামণি অর্থাৎ পুত্রবধূ প্রতিমাদেবীর অবদান অবস্মরণীয়। তিনি প্রথম

কবির রচনায় নৃত্য রূপ দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন এবং তাঁর বাবামশায়ের থেকে অনুমতি আদায় করেছিলেন।

পর্দানশিন মেয়েদের সাহস করে মঞ্চে নৃত্য পরিবেশন করিয়েছেন। তিনি প্রচুর নাটক অভিনয় করিয়েছেন ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে। কেবলমাত্র মেয়েদের দিয়ে নাটক করানোর কথা ভেবেছেন এবং কবিকে অনুরোধ জানানোর পর কবি 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' রচনা করেন। শান্তিনিকেতনে মেয়েদের প্রথম অভিনয় লক্ষ্মীর পরীক্ষা। এতে প্রতিমা দেবী নিজে ক্ষীরির চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তিনিই রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের প্রধান উৎসাহী। নিজে নৃত্যশিল্পী ছিলেন না। কিন্তু নৃত্য বিষয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন। নাচের মুদ্রা নিজেই দেখাতেন, ছেলে-মেয়েদের লিখে রাখতে বলতেন এবং কলাভবনের ছাত্রদের নিয়ে ছবি আঁকিয়ে রাখতেন। গীতিনাট্য থেকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তর এবং নৃত্য নাট্যগুলোতে বিভিন্ন নৃত্যশৈলীর সমাবেশে প্রতিমা দেবীর প্রভূত অবদান রয়েছে। তাঁর ইচ্ছায় কবি পরিশোধকে চিত্রাঙ্গদায় রূপ দিয়েছেন। এছাড়াও আরো কিছু নৃত্যনাট্যে নৃত্য রূপদান করেছেন। অথচ নিজে কখনো মঞ্চে প্রবেশ করেননি। তাঁর লেখা 'নৃত্য' বইটিতে নৃত্য বিষয়ে খুঁটিনাটি বর্ণনা করেছেন।

গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্য ছাড়াও গুরুদেব তাঁর সৃষ্ট কবিতাগুলোতে নৃত্যরূপ দিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি হলো পূজারিণী। প্রতিমাদেবী স্থির করেন গুরুদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের সন্ধ্যায় 'কথা ও কাহিনী' কাব্যগ্রন্থ অবলম্বনে পূজারিণী কবিতাটি মূকাভিনয়, আবৃত্তি, গান ও মণিপুরী নৃত্য সহযোগে পরিবেশন করাবেন। তাই কবি এই কবিতাটিকে পূর্ণাঙ্গ নাটকে রূপ দেন। প্রতিমাদেবী ছাত্রীদের অভিনয় ও নৃত্য পরিচালনা করেন এবং গানের দায়িত্বে ছিলেন দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। নাটকটির শেষ অংশে ভৈরবী রাগিণীতে রচিত 'আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো' গানটির সঙ্গে শ্রীমতি গৌরী দেবীর মণিপুরী নৃত্য সহযোগে 'শ্রীমতি'র আত্মনিবেদনের অভিনয় শিশু থেকে বয়স্ক দর্শক সবার মনেই রেখাপাত করেছিল। ১৯৩১ সালে কবির ৭০ বছর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শাপমোচন নাটকটি রচিত হয় এবং ১৯৩২ সালে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে মঞ্চস্থ হয়। অমিতা সেন ও যমুনা বসু যথাক্রমে কমলিকা ও প্রধান সখীর ভূমিকায় নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন। এরপর ১৯৩৫ সালে প্রতিমাদেবীর উৎসাহে 'চণ্ডালিকা'র মহড়া শুরু হয়। ক্যান্ডি, ভরতনাট্যম, কথাকলি, জাপানি, ইউরোপীয় এবং অন্যান্য নৃত্য মিশ্রিত হয়ে পরিবেশিত হয়। প্রকৃতি ও মায়ের ভূমিকায় নন্দিতা ও মৃণালিনী সারাভাই এবং সখীদের ভূমিকায় বেশ কিছু মহিলা শিল্পীগণের কথা জানা যায়। 'তাসের দেশ'-এ 'সংকোচেরও বিহ্বলতা' গানটির সঙ্গে জাপানি কুস্তি জুডোর ব্যায়ামের কয়েকটি ভঙ্গীর দ্বারা নৃত্যটি করা হয়েছিল। নাচের ছাত্রীরা সকলেই জুডোর প্রশিক্ষণ নিয়েছিল, ফলে তারা প্রায় সকলেই এই নাচটি করেছিল। সেই সময় গুরুদেবের উৎসাহে মেয়েরাও কুস্তির প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। এটি সেই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বলে মনে হয়।

দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় শাস্ত্রীয় নৃত্য মোহিনীআট্টম। একসময় অবক্ষয় হয়ে যাওয়া এই নৃত্যধারাটির উদ্ধার পর্বে কবি ভাল্লাখোল নারায়ণন পুনরায় শেখাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোনো ছাত্রী এই নৃত্যটি শেখার আগ্রহ প্রকাশ না করার ফলে আবারও হারিয়ে যেতে বসেছিল। সে সময় কবিগুরু কোচিন রাজার সম্মতিক্রমে ও কল্যাণী আম্মা নামে এক মোহিনীআট্টম শিল্পীকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন এবং ওখানকার ছাত্রীরাই আজকের এই জনপ্রিয় নৃত্যধারাটি প্রথম শেখেন এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ করে। বেনারস সঙ্গীত সম্মেলনের মঞ্চে প্রথমবার বালা সরস্বতী দাসীআট্টম বা দাসীনৃত্য পরিবেশন করেন এবং কবিগুরু ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কবির নৃত্যশৈলীটি পছন্দ হয় এবং পরবর্তীকালে শ্যামা নৃত্যনাট্যে মৃণালিনী সারাভাইকে দিয়ে বজ্রসেনের চরিত্রটি মঞ্চস্থ করান। মণিপুরী আঙ্গিকে নটির পূজায় মেয়েদের দিয়ে বিশেষত এই নৃত্য মঞ্চস্থ করা হয় এবং কেশব সেনের নাতনিরাও এই নৃত্যে অংশ নেবার পর ভদ্রঘরের মেয়েদের নৃত্য পরিবেশনের পথ প্রসারিত হয়। পার্শি অধ্যাপক জাহাঙ্গীর ভকিলের স্ত্রী গরবা নাচ শিখিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের মেয়েদের এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা তা পরিবেশন করতো। ড. টিম্বার্স, বিশ্বভারতীর কাজে যোগদানের আগে রুশদেশে কিছুকাল ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী মিসেস টিম্বার্স ওদেশের কিছু লোকনৃত্য শিখেছিলেন। এই নৃত্যে পায়ের ছন্দের কাজে আনন্দ উজ্জ্বল উদ্দীপনা যুক্ত ভাবটি বিশেষ লক্ষণীয়। শান্তিদেব ঘোষ সেই নৃত্যটি শেখেন এবং কবির গানের সঙ্গে ১৯৩২ সালে মাঘী পূর্ণিমাতে পরিবেশন করেন। মৃণালিনী সারাভাই, আশা ওঝা, নন্দিতা, মমতা, সুকৃতি, অনিতা, সুজাতা ইত্যাদি মহিলারা বিভিন্ন সময়ে তাঁদের নিজস্ব নৃত্যশৈলীতে নৃত্য পরিবেশন করেছেন। আর একজনের নাম করতে হয়, তিনি হলেন বিবিদি অর্থাৎ ইন্দিরাদেবী। তিনি একবার রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর বিবাহবার্ষিকীতে আলাপিনী মহিলা সমিতির মাধ্যমে একটি ছোটো নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। গুরুদেব এবং তাঁর পুত্রবধূ প্রতিমাদেবীর সম্মিলিত প্রয়াসে শান্তিনিকেতনে নৃত্য শিক্ষা এবং মঞ্চ পরিবেশন শুরু হয় যার প্রভাবে পরবর্তী প্রজন্ম প্রভাবিত।

রবীন্দ্র উত্তর যুগে বেশ কয়েকজন মহিলা নৃত্যশিল্পী গুরুদেবের রচনার সঙ্গে নৃত্য করেছেন এবং প্রশংসিত হয়েছেন। তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখিত হলো— রুক্মিণী দেবী অরুন্ডেলে 'কলাক্ষেত্র ফাউন্ডেশন মাদ্রাজ'— শ্যামা নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করেন। মৃণালিনী সারাভাই 'দর্পনা অ্যাকাডেমী' গুজরাট 'ভানুসিংহের পদাবলী' এবং 'চিত্ত যেথা ভয় শূন্য' নৃত্যরূপ দেন। কথক আঙ্গিকে শ্রীমতি শাশ্বতী সেন 'কৃষ্ণকলি', 'কুয়োরধারে', 'অভিসার', 'দেবতার গ্রাস' ইত্যাদিতে নৃত্যরূপ দিয়েছেন। শ্রীমতি থাঙ্কমণি কুটটির পরিচালনায় ভরতনাট্যম এবং কথাকলি আঙ্গিকে শ্যামা, চণ্ডালিকা ইত্যাদি মঞ্চস্থ করেন। ড. মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার নবনৃত্য আঙ্গিকে 'তাসের দেশ', 'তোমারি মাটির কন্যা' মঞ্চস্থ করেন। বিশিষ্ট মোহিনীআট্টম শিল্পী পদ্মশ্রী ভারতী শিবাজী 'ভানুসিংহের পদাবলী' করেন। শ্রীমতি মহুয়া মুখোপাধ্যায় গৌড়ীয় নৃত্য আঙ্গিকে চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, শাপমোচন, রবিগানে অষ্টনায়িকা, সকল রসের ধারা ইত্যাদি করেন। বানানী চক্রবর্তী গৌড়ীয় নৃত্য আঙ্গিকে তাসের দেশ, চণ্ডালিকা করেন। শ্রীমতি অলকানন্দা রায় পশ্চিমবঙ্গে সংশোধনাগারের শিল্পীদের দিয়ে কালজয়ী নৃত্যনাট্য 'বাল্মীকি প্রতিভা' মঞ্চস্থ করান।

শেষোক্ত একটি কথা না বললে বিষয়টি অপূর্ণ থেকে যায় তা হলো— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে নৃত্যশিল্পী ছিলেন না, তথাপি ভারতবর্ষের নৃত্য জগতে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে গেলেন। যদিও তার জন্য তাঁকে অনেক প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

***(লেখিকা সংস্কার ভারতী, বাগুইআটির সদস্যা)***

# কানাডায় আক্রান্ত ভারতীয়রা

ভারত-বিরোধিতার মুক্তাঞ্চলে ক্রমশ পরিণত হচ্ছে কানাডা। সৌজন্যে খালিস্তানি আন্দোলন। সেদেশের গ্রেটার অন্টারিও এলাকার ব্র্যাম্পটনে একটি হিন্দু মন্দিরে হামলার অভিযোগ ওঠে কানাডার খালিস্তানিদের বিরুদ্ধে। সেখানে দর্শনার্থীদের ওপর হামলা চালায় তারা। সোশ্যাল মিডিয়ায় কানাডার সংবাদমাধ্যম দ্য ন্যাশনাল টেলিগ্রাফের সাংবাদিক ড্যামিয়েল ব্রডম্যানের পোস্ট করা ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, লাঠি নিয়ে ছুটে এসে কয়েকজন হামলা চালাচ্ছে। তারই মধ্যে এক মহিলাকে চিৎকার করতেও শোনা গিয়েছে। অভিযোগ ওঠে, মন্দির চত্বরে ঢুকে দর্শনার্থীদের ওপর চড়াও হয়েছে খালিস্তানিরা। পরে কানাডার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, খালিস্তানিরা পতাকা নিয়ে ঢুকে পড়ে মন্দির চত্বরে। সেখানে দর্শনার্থীদের পতাকার লাঠি দিয়েই মারতে শুরু করে তারা। অপর এক ঘটনায় সারের লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে খালিস্তানি এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের মুখোমুখি বিক্ষোভ দেখা যায়। সেই ঘটনায় তিন হিন্দুকে জোরপূর্বক গ্রেপ্তার করতে দেখা যায় সারে পুলিশকে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের সামনে খালিস্তানিরা ভারত বিরোধী বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল। সেই সময় লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে আগত ভক্তরাও পালটা প্রতিবাদ দেখায়। সেই সময় হিন্দু ভক্তদের মধ্যে থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে কোনো চার্জ আনা হয়েছে, তাও বলেনি তারা। যার জেরে উত্তেজনা ছড়ায়। এই আবহে মন্দির কমিটির সভাপতি সতীশ কুমার বলেছেন, এরপর থেকে সারে পুলিশকে আর মন্দির চত্বরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। এদিকে সেখানে কানাডা পুলিশ এবং খালিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরও তীব্র হয়। ভারতীয় পতাকা উড়িয়ে ভক্তরা স্লোগান তোলেন খালিস্তানিদের বিরুদ্ধে। দুটি ঘটনাতেই কানাডার পুলিশ- প্রশাসনের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত নক্কারজনক। যেখানে খালিস্তানি হামলা থেকে ভারতীয়দের বাঁচাবার কোনো চেষ্টা তো তারা করেইনি, উপরন্তু যেখানে ভারতীয়রা পালটা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন, সেখানে ভারতীয়দের উপরেই কানাডা পুলিশের আক্রমণ নেমে এসেছে।

এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে যে ভারত চুপ করে থাকবে না তা বুঝিয়ে দিয়েছেন এদেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোশ্যাল মিডিয়ায় মোদীজী লেখেন, 'কানাডায় হিন্দু মন্দিরে এই হামলার তীব্র ভাষায় নিন্দা জানাচ্ছি আমি। আমাদের কূটনীতিকদের যেভাবে ভয় দেখানো হয়েছে, তাতেও আমি হতবাক। এই ধরনের হিংসার ঘটনা কখনও ভারতের দৃঢ় সংকল্পকে টলাতে পারে না। আমরা আশা করছি, কানাডা সরকার এর বিচার করবে এবং আইনের শাসন বজায় রাখবে।' আর এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সরাসরি কানাডিয়ান প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সরকারের নাম উল্লেখ করে হুঁশিয়ারী দিয়ে বলেছেন, 'এইভাবে ভয় দেখিয়ে ভারতীয়দের দৃঢ় মানসকতাকে টলানো যাবে না।'

> **প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, 'কানাডায় হিন্দু মন্দিরে এই হামলার তীব্র ভাষায় নিন্দা জানাচ্ছি আমি। আমাদের কূটনীতিকদের যেভাবে ভয় দেখানো হয়েছে, তাতেও আমি হতবাক। এই ধরনের হিংসার ঘটনা কখনও ভারতের দৃঢ় সংকল্পকে টলাতে পারে না।....'**

এনিয়ে বিবৃতি দিয়েছে কানাডায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনও। তাদের বক্তব্য : 'টরন্টোর কাছে ব্র্যাম্পটনে হিন্দু সভা মন্দিরের সঙ্গে মিলে কনস্যুলার ক্যাম্পের আয়োজন করেছিল ভারতীয় হাইকমিশন। সেখানে আজ ভারত বিরোধীরা এসে হিংসাত্মক হামলা চালায়। কনস্যুলার কাজে এই ধরনের ব্যাঘাত ঘটতে দেখে আমরা খুবই হতাশ। এদিকে ভারতীয় নাগরিক এবং স্থানীয় যে ব্যক্তিরা এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের আবেদন জানান, তাঁদের নিরাপত্তার জন্যও খুব উদ্বিগ্ন আমরা।'

খালিস্তানপন্থী নেতা হরদীপ সিংহ নিজ্জরের হত্যার পর থেকেই ভারত এবং কানাডার মধ্যে সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকেছে। এর মধ্যেই মার্কিন দৈনিক 'দ্য ওয়াশিংটন পোস্টে'র প্রতিবেদনে আবার দাবি করা হয়েছে, ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শার নির্দেশেই নিজ্জরকে হত্যা করা হয়েছিল। কূটনীতিকদের অনুমান, আমেরিকার ইন্ধন ছাড়া একথা বলা সম্ভব নয়। এই ধরনের চাপের খেলা আমেরিকার পক্ষে নতুনও নয়। যাইহোক, এমন কূটনৈতিক উষ্ণতার আবহেই ভারত-কানাডীয় সম্প্রদায়ের মানুষকে ট্রুডো দীপাবলীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। অন্যদিকে কানাডার মাটিতে হিন্দুদের ওপর হামলায় তাঁর পুলিশ- প্রশাসন নির্বিকার। আপাতত তাঁর এই দুমুখো নীতি, কূটনীতির পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'ক্রিয়েটিভ অ্যাম্বিগুইটি' (সৃজনশীল দ্ব্যর্থতা)-র দিকে কড়া নজর নয়াদিল্লির। □

# ‘এক দেশ এক নির্বাচন’ ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা অসম্ভব নয়

**একযোগে নির্বাচন মানে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের তিনটি স্তরের নির্বাচন অর্থাৎ হাউস অব দ্য পিপল (লোকসভা), রাজ্য বিধানসভা এবং স্থানীয় সংস্থাগুলির নির্বাচন সুসংগত পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হওয়া। এর অর্থ হলো একজন ভোটার একই দিনে সরকারের সকল স্তরের সদস্যদের নির্বাচন করার জন্য নিজের ভোট প্রদান করবেন।**

**ধর্মানন্দ দেব**

সমগ্র দেশে ‘এক দেশ, এক ভোট’ নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই ‘এক দেশ এক ভোট’-এর ধারণাটি আজ নতুন নয়। বিষয়টির সঙ্গে আমরা অপরিচিতও নই বলা যায়। দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ১৯৫১-৫২ সাল থেকে টানা ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত আমরা মোটের উপর বলতে পারি ‘এক দেশ এক ভোট’ দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৫৯ সালে জওহরলাল নেহরু প্রথম কেরালায় ইএমএস নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট সরকারকে ৩৫৬ ধারা জারি করে ফেলে দেওয়ার পর সাময়িকভাবে ‘এক দেশ এক ভোট’-এর শৃঙ্খলটি ছিন্ন হয়। ১৯৬৭ সালের পর থেকে ইন্দিরা গান্ধী ধারাবাহিকভাবে রাজ্যে-রাজ্যে ৩৫৬ ধারা জারি করতে শুরু করায় স্থায়ীভাবে শৃঙ্খলটি ছিন্ন হয়ে যায়। প্রায় ৩৯টি সরকার ফেলেছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী শুধুমাত্র সংবিধানের ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে। ছয়ের দশকের শেষ থেকে অবশ্য রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণেও বহু ক্ষেত্রে লোকসভা ও বিধানসভা পাঁচ বছরের মেয়াদ সম্পূর্ণ করতে পারেনি। বার বার অকাল বিধানসভা ও লোকসভা ভোট হয়েছে দেশে। স্বাভাবিকভাবে ‘এক দেশ এক ভোট’ শৃঙ্খলটি রক্ষা করা যায়নি।

ইন্দিরা গান্ধীর জমানায় ১৯৮৩ সালে ফের ‘এক দেশ এক ভোট’ শৃঙ্খলটি ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব আসে। সে সময় প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের কাজ থেকেই এসেছিল। ‘এক দেশ এক ভোট’ শৃঙ্খলটি ফিরিয়ে আনার জন্য আর্থিক সাশ্রয়কেই কমিশন প্রধানতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। তাই সরকারের অহেতুক খরচ বাঁচাতে নির্বাচন কমিশন সারা দেশে পাঁচ বছর অন্তর একটা ভোট চেয়েছিল। কমিশনের এই ভাবনাকে সমর্থন জানিয়েছিল প্রতিটি রাজনৈতিক দলই। তারপর দেশে ধারাবাহিকভাবে ‘এক দেশ এক ভোট’-এর বিষয়টি চর্চায় থাকলেও সেটি বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে সামগ্রিক প্রচেষ্টা কখনোও দেখা যায়নি। তার পিছনে কী কারণ হতে পারে তা আজ সরকার বিরোধী দলগুলির ভূমিকার দিকে তাকালেই আমাদের সামনে স্পষ্ট ফুটে উঠে। ১৯৯৯ সালের আইন কমিশন প্রস্তাবটি রূপায়ণ করার কথা বলেছিল। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী তাঁর নির্বাচনী ইস্তেহারে বিষয়টি রেখেছিলেন। ২০১৭ সালে নীতি আয়োগ এই নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করে।

২০১৮ সালে আইন কমিশন তার রিপোর্টে জানায় সংবিধান সংশোধন ও জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের পরিবর্তন ছাড়া ‘এক দেশ এক ভোট শৃঙ্খলটি রূপায়িত করা যাবে না। সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাবটি দেশের অর্ধেক রাজ্যের বিধানসভায় অনুমোদন করাতে হবে বলেও জানায় আইন কমিশন। কারণ ‘এক দেশ এক ভোট’ রূপায়িত করতে গেলে কেন্দ্রকে প্রয়োজনমতো লোকসভা ও কিছু রাজ্যের বিধানসভার মেয়াদ সাময়িকভাবে বাড়াতে ও কমাতে হবে, যার জন্য সংবিধানের ৮৩(২) ও ১৭২(১) ধারায় সংশোধন জরুরি। কেননা সংবিধানের ৮৩ এবং ১৭২ নম্বর অনুচ্ছেদে সংসদ এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির মেয়াদ কতদিনের হবে, তা বলা আছে। বর্তমানে লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে একই সঙ্গে নির্বাচন হয় তিনটি রাজ্যের— অন্ধ্রপ্রদেশ, সিকিম এবং ওড়িশা। ২০২৪ সালের শেষের দিকে ভোট হবে হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্যে। এই বছরই দীর্ঘ ছ’ বছর পর বিধানসভা নির্বাচন হচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীরেও। কাজেই এই রাজ্যগুলির নির্বাচনকে লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে সমন্বিত করাটা খুব অসুবিধার হবে না বলা যায়। কিন্তু বাকি রাজ্যগুলির ভোট লোকসভা ভোটের বছরে হয় না। সেগুলিকে এক জায়গায় আনতে গেলে হয় কোনো কোনো রাজ্যের বিধানসভার মেয়াদ কমিয়ে অথবা বাড়িয়ে দিতে হবে।

উদাহরণ হিসেবে বিষয়টি আরও পরিষ্কার করা যাক। অসম ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আর সমগ্র দেশে ২০২৯-এ পরবর্তী লোকসভা নির্বাচন। কাজেই পশ্চিমবঙ্গ ও অসম রাজ্যের ভোটকে ২০২৯-এর লোকসভা ভোটের সঙ্গে একযোগ করতে হলে, ২০২৬-এ নির্বাচিত সরকারকে ২০২৯-এই ভেঙে দিতে হবে। নয়তো, ২০২১-এর নির্বাচিত সরকারকেই ২০২৯ পর্যন্ত বহাল রাখতে হবে। তাই এর জন্য সংসদে ওই দুই অনুচ্ছেদে সংশোধন

ফঃ ২

আনা প্রয়োজন। এছাড়াও, এক দেশ এক ভোট পদ্ধতি দেশজুড়ে বলবৎ করতে সংবিধানের আরও বেশ কিছু অনুচ্ছেদ বদলের প্রয়োজন হতে পারে। ৮৫ নম্বর অনুচ্ছেদে লোকসভা ভেঙে দেওয়ার নিয়ম নথিবদ্ধ রয়েছে। ১৭৪ নম্বর অনুচ্ছেদে বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার নিয়ম নথিবদ্ধ রয়েছে। এ ছাড়া ৩৫৬ নম্বর ধারায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি সংক্রান্ত বিধি সংশোধন করতে হবে।

বিচারপতি বিপি জীবন রেড্ডির নেতৃত্বাধীন আইন কমিশন ১৯৯৯ সালের মে মাসে ১৭০তম রিপোর্টে জানিয়েছিল, 'আমাদের অবশ্যই সেই পরিস্থিতিতে ফিরে যেতে হবে যেখানে লোকসভা এবং সমস্ত বিধানসভার নির্বাচন একবারে অনুষ্ঠিত হয়।' ২০০২ সালে, সংবিধানের কার্যকারিতা পর্যালোচনা সম্পর্কিত জাতীয় কমিশন 'একযোগে নির্বাচন ব্যবস্থা'কে পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানায়। ২০০৩ সালে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধীর কাছে বিষয়টি তুলেছিলেন। ২০১০ সালে, বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবাণী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের সঙ্গে দেখা করেন। তারপরে তিনি লিখেছিলেন, 'আমি তাঁদের উভয়কেই (প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়) একটি প্রস্তাবের প্রতি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছি যা আমি বেশ কিছুদিন ধরেই জানাচ্ছি। স্থির মেয়াদী বিধানসভা এবং একযোগে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন।' তিনি উল্লেখ করেছেন, দেশ প্রতি পর্যায়ক্রমে একটি 'মিনি-সাধারণ নির্বাচন' প্রত্যক্ষ করেছে এবং লিখেছেন, 'এটি আমাদের কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার বা আমাদের রাজনীতির স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়।' বিজেপি তার ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনী ইস্তেহারে বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচন একই সঙ্গে পরিচালনার জন্য একটি পদ্ধতি তৈরি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

২০১৪ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী হন মোদী। ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে রাজ্যসভার সদস্য ই এম সুদর্শন নাচিপ্পানের নেতৃত্বে একটি সংসদীয় কমিটিও এই নির্বাচন ব্যবস্থার বাস্তবায়নের জন্য জোর দিয়েছিল। ২০১৫ সালের একটি রিপোর্টে 'জনগণ এবং রাজ্য বিধানসভায় একযোগে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাব্যতা' শিরোনামে, Department related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice একযোগে নির্বাচন অনুষ্ঠানের একটি বিকল্প এবং বাস্তবসম্মত পদ্ধতি সুপারিশ করেছে। এই ধারণার মধ্যে ছিল দুটি ধাপে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, লোকসভার মেয়াদের অর্ধেক এবং বাকী সময়ের জন্য লোকসভার মেয়াদ শেষে। এরপর ২০১৬ সালে 'এক দেশ, এক ভোট' নীতি নিয়ে নড়েচড়ে বসে কেন্দ্রের সরকার। ২০১৭ সালে নীতি আয়োগের তরফে একযোগে নির্বাচনের প্রস্তাবের উপর একটি সুপারিশপত্র 'Analysis of Simultaneous Elections-The What, Why and How' শিরোনামে তৈরি করে জমা করে কেন্দ্রের কাছে। আইন কমিশনের রিপোর্ট (খসড়া), ২০১৮, আবারও একযোগে নির্বাচনের গুরুত্ব এবং সুবিধাগুলির ওপর জোর দেয়। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনোভাবেই একযোগে নির্বাচন আয়োজন সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে না। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটের ইস্তাহারেও 'ওয়ান নেশন, ওয়ান ভোট' উল্লেখ করেছিল বিজেপি।

'এক দেশ এক ভোট' কার্যকরের দিশানির্দেশিকা খুঁজতে ২০২৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে কমিটি গড়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। ২০২৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর ভারত সরকার একযোগে নির্বাচনের বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য উচ্চ-পর্যায়ের কমিটি গঠন করে এক সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এই সরকারি নোটিফিকেশনে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল— '...the Government of India hereby constitutes a High Level Committee to examine the issue of simultaneous elections and make recommendations for holding simultaneous elections in the country.' রামনাথ কোবিন্দ ছাড়াও এই কমিটিতে রয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, রাজ্যসভায় বিরোধী দলের প্রাক্তন নেতা গুলাম নবি আজাদ, প্রাক্তন অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান এন কে সিং, লোকসভার প্রাক্তন মহাসচিব সুভাষ কাশ্যপ, সিনিয়র অ্যাডভোকেট হরিশ সালভে এবং প্রাক্তন চিফ ভিজিলেন্স কমিশনার সঞ্জয় কোঠারি। আইন ও বিচার মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্ব) অর্জুন রাম মেঘওয়াল ছিলেন একজন বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য এবং ড. নীতেন চন্দ্র কমিটির সচিব ছিলেন। লোকসভায় কংগ্রেসের নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীকেও প্যানেলের সদস্য করা হয়েছিল, যদিও এই নির্বাচনী ব্যবস্থার বিরোধিতা করে কমিটির সদস্য হওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন তিনি।

ওই কমিটি ২০২৪ সালের ১৪ মার্চ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে গিয়ে একসঙ্গে লোকসভা এবং সবক'টি বিধানসভার নির্বাচন করানোর সুপারিশ করে ১১টি অধ্যায় ও ২১টি সংযোজিত খণ্ড অন্তর্ভুক্ত করে মোট ১৮ হাজার ৬২৬ পাতার রিপোর্টটি জমা করে। ঠিক কী বলা হয়েছে এই রিপোর্টে? কোবিন্দ কমিটির সুপারিশে রয়েছে, প্রথম ধাপে লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচন একসঙ্গে হতে পারে। পরবর্তী ১০০ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় ধাপে পুরসভা-পঞ্চায়েত নির্বাচন হোক। কমিটির এও সুপারিশ, লোকসভা ভোট পর্যন্ত রাজ্যের বিধানসভাগুলির মেয়াদ করা হোক। এছাড়াও কক্ষ ত্রিশঙ্কু হলে বা যদি বিরোধীরা সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনে, তাহলে নতুন করে নির্বাচন হোক। তবে এই নির্বাচন ওই ৫ বছরের বাকি মেয়াদকালের জন্য হবে। কমিটি তার রিপোর্টে এও দাবি করেছে, 'এক দেশ এক ভোট' চালু করা হলে বিপুল অর্থের সাশ্রয় হবে। যা পরে রাজনৈতিক দলগুলিই দেশের উন্নয়নের স্বার্থে কাজে লাগাতে পারবে। পাশাপাশি, আলাদা নির্বাচন মানে প্রতি ক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যায় জনবল অর্থাৎ কর্মী-অফিসারদের কাজে লাগাতে হয়। ফলে সরকারি কাজ ব্যাহত হয়। এছাড়াও আদর্শ আচরণবিধি প্রয়োগের ফলেও সরকারি কাজ থমকে থাকে। এক সঙ্গে ভোট হলে পাঁচ বছরে একবার মাস দেড়েকের জন্য আদর্শ আচরণ বিধি চালু থাকবে। এছাড়াও দুটি সংবিধান সংশোধনী বিলের মাধ্যমে মোট ১৫টি সংশোধনী আনার সুপারিশ করেছে কোবিন্দ কমিটি। ২০২৯ থেকে কোবিন্দ

কমিটির সুপারিশ কার্যকর করতে হলে সারা দেশের মোট ১৭টি বিধানসভার মেয়াদ হবে ৩ বছরেরও কম। সংবিধানের তিনটি অনুচ্ছেদ সংশোধন করে তার সঙ্গে ১২টি উপধারা যোগ করা হবে যেমন ৮২এ, ৮৩(৩), ৮৩(৪), ১৭২(৩), ১৭২(৩), ১৭২(৪), ৩২৪এ, ৩২৫(২), ৩২৫(৩) ইত্যাদি। পাশাপাশি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং বিধানসভার ক্ষেত্রে তিনটি আইন পরিবর্তন করার প্রস্তাব দেওয়া হবে সংশোধনীতে। সব মিলিয়ে সংশোধনীর সংখ্যা হতে পারে ১৮।

রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বাধীন কমিটির কাছে ভারতের সুপ্রিমকোর্টের শেষ চারজন প্রধান বিচারপতি তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছেন। এরা হলেন বিচারপতি দীপক মিশ্র, রঞ্জন গগৈ, শরদ অরবিন্দ বোবদে এবং বিচারপতি ইউ ললিত। সবাই একযোগে নির্বাচনের পক্ষে মত দিয়েছেন। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন হাইকোর্টের ১২ জন প্রাক্তন মুখ্যবিচারপতির মতামত রয়েছে রিপোর্টে, তার মধ্যে তিনজন যথাক্রমে দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তন মুখ্যবিচারপতি অজিত প্রকাশ শাহ, কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন মুখ্যবিচারপতি গিরিশচন্দ্র গুপ্ত এবং মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রাক্তন মুখ্যবিচারপতি সঞ্জীব ব্যানার্জী একযোগে নির্বাচনের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং বাকি ৯ জন হাইকোর্টের প্রাক্তন মুখ্যবিচারপতি পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কমিটির কাছে মোট ৪৭টি রাজনৈতিক দল 'এক দেশ-এক নির্বাচন' সম্পর্কে নিজেদের মতামত দিয়েছে। এর মধ্যে ৩২টি দল এই প্রস্তাবের পক্ষে মত দিয়েছে। আর ১৫টি রাজনৈতিক দল এর বিপক্ষে মত দিয়েছে। এনডিএ-র জোটসঙ্গী টিডিপি-সহ কয়েকটি দল কোনোপক্ষে মতামত দেয়নি। যারা প্রস্তাবের পক্ষে মতামত দিয়েছে তারা অধিকাংশই এনডিএর জোটসঙ্গী। সঙ্গে রয়েছে ওড়িশার প্রধান বিরোধী দল বিজেডি। যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে মত দিয়েছে তারা অধিকাংশই কংগ্রেসের জোটসঙ্গী বা ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গী। যে যে দল এই প্রস্তাবের পক্ষে মত দিয়েছে, তাদের সব ভোট যোগ করলে লোকসভায় সাংসদ সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭১। যারা যারা কোনো পক্ষে মত দেয়নি তাঁদের সাংসদসংখ্যাও যদি যোগ করা হয়, তাহলে সংখ্যাটা দাঁড়ায় ২৯৩। লোকসভার সব সাংসদ উপস্থিত থাকলে সংবিধান সংশোধনের জন্য প্রয়োজন হয় ৩৬২ জন সাংসদের সমর্থন। ২৯৩ জন সাংসদের সমর্থনে এই প্রস্তাব পাশ করাতে হলে লোকসভায় সাংসদের উপস্থিতি কমিয়ে আনতে হবে ৪৩৯ জনে। অর্থাৎ শতাধিক সাংসদকে ভোটদানে বিরত থাকতে হবে। আর তা না হলে বিরোধী শিবিরের কোনও দলকে সরকারের পক্ষে আনতে হবে। রাজ্যসভাতেও পরিস্থিতি একই। রাজ্যসভায় এই সংবিধান সংশোধনী পাশ করাতে হলে সরকারের প্রয়োজন ১৬৪ জন সাংসদের সমর্থন। এনডিএ-র হাতে এই মুহূর্তে আছে মাত্র ১২০ জন সাংসদের সমর্থন। এখন দেখার বিষয় সরকার ঘুরপথে সাংবিধানিক সংশোধনী এড়িয়ে বিলটি পাশ করাতে পারে কিনা।

নরেন্দ্র মোদী সরকার 'এক দেশ এক ভোট' (ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন) নীতি কার্যকরের পথে সম্প্রতি আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়েছে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে পাশ হয়েছে 'এক দেশ এক ভোট' নীতি কার্যকরের লক্ষ্যে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বাধীন কমিটির সুপারিশ। এর ফলে সংসদের অধিবেশনে এই নীতি কার্যকর করার লক্ষ্যে কেন্দ্র বিল পাশে সক্রিয় হবে বলে মনে করা হচ্ছে। শীতকালীন অধিবেশনেই এই ব্যাপারে বিল আনার পরিকল্পনা রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের। শোনা যাচ্ছে, দেশজুড়ে সব স্তরে অভিন্ন নির্বাচন চালু করতে তিনটি বিল আনা হবে। তার মধ্যে দুটি বিল থাকবে লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচন সংক্রান্ত, তৃতীয়টি দেশের সব পঞ্চায়েত ও পুরোনিগমে একসঙ্গে নির্বাচন করার জন্য সংবিধান সংশোধন সম্পর্কিত। লোকসভা এবং বিধানসভার মেয়াদ সম্পর্কিত দুটি উপাধারা যোগ করা হবে। এছাড়া লোকসভা ও বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার বিষয়টি থাকবে পৃথক উপধারায়। আরেকটি উপধারায় উল্লেখ করা হবে অভিন্ন নির্বাচনের বিষয়টি। প্রস্তাবিত সংবিধান সংশোধনী বিলের যেটিতে পঞ্চায়েত এবং পুরনিগমের নির্বাচনকে বিধানসভা এবং লোকসভা ভোটের সঙ্গে করার কথা বলা হবে, সেটিকে আইনে পরিণত করতে অন্তত ৫০ শতাংশ রাজ্যের সমর্থন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে কেন্দ্রকে। দ্বিতীয় সংবিধান সংশোধনী বিলে থাকবে স্থানীয় স্তরে নির্বাচনের জন্য জাতীয় নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনের আলোচনার মাধ্যমে ভোটার তালিকা তৈরির বিষয়টি। তৃতীয় সংবিধান সংশোধনী হবে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি সম্পর্কিত।

পরিশেষে বলব, একযোগে নির্বাচন মানে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের তিনটি স্তরের নির্বাচন অর্থাৎ হাউস অব দ্য পিপল (লোকসভা), রাজ্য বিধানসভা এবং স্থানীয় সংস্থাগুলির নির্বাচন সুসংগত পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হওয়া। এর অর্থ হলো একজন ভোটার একই দিনে সরকারের সকল স্তরের সদস্যদের নির্বাচন করার জন্য নিজের ভোট প্রদান করবেন। 'এক দেশ এক নির্বাচন' নিয়ম কার্যকর হলে সারা দেশে একসঙ্গে লোকসভা, বিধানসভা, পঞ্চায়েত ও পুরসভা নির্বাচনের আয়োজন করবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। একসঙ্গে ভোট করাতে সংবিধানের দুটি অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে। যুক্ত করতে হবে নতুন শব্দ। 'ফুল টার্ম' ও 'আনএক্সপায়ার্ড পিরিয়ড'। ফুল টার্ম মানে পাঁচ বছর আনএক্সপায়ার্ড পিরিয়ড— যদি সরকার পাঁচ বছরের আগেই পড়ে যায়। তবে হ্যাঁ, লোকসভা-বিধানসভার ভোট একসঙ্গে করাতে সংবিধান সংশোধন হলেও তা দেশের ৫০ শতাংশ রাজ্য বিধানসভায় পাশ করাতে হবে না। এছাড়া, বিধানসভা-যুক্ত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের তিনটি আইন সংশোধন করতে হবে। এগুলি হলো ১৯৯১ সালের ন্যাশনাল ক্যাপিটাল টেরিটরি অব দিল্লি অ্যাক্ট-এর ৫ নম্বর ধারা, ১৯৬৩ সালের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকার আইনের ৫ নম্বর ধারা এবং ২০১৯ সালের জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন আইনের ১৭ নম্বর ধারা। তবে গোটা দেশের ৩ হাজার ৪০৮টি পুরসভা এবং ২ লক্ষ ৫৬ হাজার ৯৯০টি পঞ্চায়েত একসঙ্গে ভোট করানোর জন্য সংবিধান সংশোধন করে তা ৫০ শতাংশ রাজ্য বিধানসভায় পাশ করাতেই হবে। দেশজুড়ে রাজনৈতিক ঐক্যমত্য গঠন করে, সেই সহমতির ভিত্তিতে সেটা ২০২৯ সালের আগে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয় কিনা, সেটাই দেখার।

***(লেখক পেশায় আইনজীবী)***

## ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা

# পশ্চিমবঙ্গটা আফগানিস্তান, পাকিস্তান বা বাংলাদেশ না হয়ে উঠুক

**বরুণ মণ্ডল**

মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রকাশ, কলকাতার গার্ডেনরিচের নিউ বেঙ্গল স্পোর্টিং ক্লাবের পূজামণ্ডপে এসে আজানের সময় মাইক বাজানোতে একদল মুসলমান জনতা হাঙ্গামা করে। উদ্দেশ্য আজানের সময় মাইক বাজানো বন্ধ করা। এছাড়া এবারের পশ্চিমবঙ্গের দুর্গোৎসবে এ ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা বেশ কয়েকটা ঘটেছে। সব তো আর প্রকাশ্যে আসে না। ছোট্ট ঘটনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না, এটা অনেক বড়ো ঘটনা। কেননা পশ্চিমবঙ্গ সেই ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য যে রাষ্ট্রের সংবিধান সব ধর্মের সমান অধিকার রয়েছে। আইন মেনে প্রশাসনিক ভাবে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের বিচার চাওয়া যেতেই পারে। কিন্তু এভাবে গাজোয়ারি দেখানো সংবিধান বিরোধী তো বটেই। আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। প্রশাসন কি করে দেখা যাক, তার আগে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করে নেওয়া হোক।

বর্তমান বাংলাদেশের হিন্দু বিরোধী প্রতিচ্ছবির কি ট্রেলার দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতেই? এ প্রশ্নটা কিন্তু ঘুরে ফিরে উঠে আসছে ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। মুসলমান অধ্যুষিত পৃথিবীর সমস্ত এলাকায় ইসলাম বিরোধী যে কোনো ধর্মাচরণ করা যেন অপরাধের সমান। অথচ দিনে পাঁচবার মাইক বাজিয়ে ইসলামধর্মীরা, ধর্মীয় কার্যকলাপ চালান। কোথাও কিন্তু কোনো প্রতিবাদ এসেছে বলে মনে নেই। সমস্ত ধর্মমতের কাছে ইসলামের এই মাইকের আজান সহিষ্ণুতার সঙ্গে মেনে নেয়। কিন্তু ইসলামপন্থীরা কেন অন্য ধর্মমতের ধর্মীয় কার্যকলাপ সহিষ্ণুতার সঙ্গে মেনে না? শুভ চেতনা সম্পন্ন মুসলমানদের কাছে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলাম।

ইসলামপন্থীরা মূর্তি পূজার ঘোর বিরোধী। যারা মুসলমান অর্থাৎ ইসলামপন্থী তারা মূর্তি পূজা করলে সেক্ষেত্রে মূর্তি ভাঙচুর করাটা তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার মধ্যে পড়ে। কিন্তু যারা ইসলামপন্থী নন যারা মূর্তির পূজারী, তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে কেন মূর্তি ভেঙে দেওয়া হবে? ধর্মাচরণ কি জোর করে কারোর উপর চাপিয়ে দেওয়া যায়? এই আধুনিক যুগে এসেও কেন এই বালখিল্যলতা? ধর্মীয় মৌলবাদীরা ইসলাম ধর্মকে 'শান্তিরধর্ম' বলতে পছন্দ করেন, কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পৃথিবীর সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে ইসলামপন্থীদের সহবস্থান সহজে ঘটে না। হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের সহ-বাসস্থানে অশান্তি, খ্রিস্টানদের সঙ্গে মুসলমানের সহ-বস্থানে অশান্তি, ইহুদিদের সঙ্গে মুসলমানের সহবস্থানে অশান্তি, বৌদ্ধদের সঙ্গে মুসলমানদের সহবস্থানে অশান্তি, এমনকী যেখানে অন্য ধর্মতাবলম্বী নেই অর্থাৎ শুধুই মুসলমান জনগোষ্ঠী সেখানেও অশান্তি। অর্থাৎ ইসলাম শান্তির ধর্ম সেটা কিন্তু বাস্তবে প্রমাণ হয় না। পৃথিবীতে যতগুলো জঙ্গিগোষ্ঠী আছে তার সিংহভাগ ইসলামপন্থী। যদিও একথা বললে একদল চিৎকার, করে বলবে 'জঙ্গিদের কোনো ধর্ম হয় না'। অথচ ধর্মকে হাতিয়ার করে জঙ্গিগোষ্ঠী নৃশংস কাজ করলেও তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 'সাচ্চা মুসলমানরা' কখনো করেননি।

সারা পৃথিবীটাকে ইসলামের হেফাজতে নিয়ে আসা তাদের স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন সত্যি করতে তারা জীবনপণ করে দিয়েছে। অমানবিক এবং নিকৃষ্টতম কাজ করতেও তারা পিছপা নয়। আপাত লক্ষ্য পৃথিবীটাকে ইসলামের শরিয়তি আইনে বেঁধে ফেলা। কিন্তু তাতে লাভটা কি? তারা কি ভেবে দেখেছে? গজবা-এ-হিন্দ অর্থাৎ সমগ্র হিন্দুস্তানকে ইসলামিকরণ করা। তর্কের খাতিরে ধরেই নিলাম আল্লাহর সেই হুকুম তামিল করতে তারা বদ্ধপরিকর। আরেকটু

এগিয়ে গিয়ে ধরেই নিলাম সমগ্র বিশ্ব ইসলামের হেফাজতে এসে গেছে। তবেই কি সারা পৃথিবীতে শান্তির দূতের হেফাজতে থেকে 'স্বর্গীয় শান্তি বিরাজ করবে? ব্যাপারটা একটু বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার।

শরিয়তি আইনে থেকেই আজ আফগানিস্তানের কি অবস্থা? একই স্বপ্ন দেখতে গিয়ে আজ পাকিস্তানের কি অবস্থা? সেই স্বপ্নে শামিল হয়েছে বাংলাদেশ, কী তার অবস্থা? বিশ্বের যে কটা দেশ দেউলিয়া ঘোষিত হয়েছে তার অধিকাংশ ইসলামের গোঁড়ামি নিয়ে বেশি মেতে উঠেছিল। কোনো দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করে ধর্মনীতির উপর

কি নাগরিকদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা যায়? যে ধর্মনীতিতে সুদহীন ব্যাংক, শিল্প সংগীত, বাদ্যযন্ত্র, সাহিত্য চর্চা বিহীন সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক সেই নীতি আদর্শ কী আদপেই সভ্য মানুষের জন্য প্রযোজ্য? যে নীতিতে অনিয়ন্ত্রিত যৌনাচারে, উত্তেজক খাদ্য খাবারের অনুমোদন দেওয়া হয়, পর ধর্ম অসহিষ্ণুতা ইন্ধন দেওয়া হয়, নারী

জাতিকে বোরখা পরিয়ে, তালাকপ্রথা প্রচলন রেখে ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করা হয়, তা কখনো কী মানব সমাজের শ্রেষ্ঠ নীতি বলে মান্যতা দেওয়া যেতে পারে?

সারা বিশ্বে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক গবেষণা হচ্ছে, ইতিপূর্বে প্রচুর বিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেছেন। যার সুযোগ সুবিধা এবং ফললাভ সমগ্র বিশ্ব গ্রহণ করেছে। ইসলাম সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে জীবন উন্নততর করেছে। কিন্তু শরিয়তি মান্যকারী এবং ইসলামিক শিক্ষা গ্রহণকারী কতজন ব্যক্তি পৃথিবী পরিবর্তনকারী বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের সঙ্গে

সত্ত্বেও তাকে 'সাচ্চা মুসলমান' মানেন না মৌলবাদী ইসলামপন্থীরা। সর্বধর্ম সমন্বয়কারী কালীমূর্তির আরাধনা সূচক শ্যামাসংগীতের লেখক ধর্মনিরপেক্ষ কবি নজরুলকে 'সাচ্চা মুসলমান' মানেন না।

বিশ্বের যে সমস্ত দেশ যথা আরব দেশীয় রাষ্ট্রগুলি অর্থনীতিতে উন্নতি করছে, সেখানে ইসলাম নিয়ে একগুঁয়েমি মানসিকতা নেই। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশে হিন্দু মন্দির, হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি ভেঙে ফেলা হচ্ছে অথচ আরব দেশগুলিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে কৃষ্ণমন্দির, রামমন্দির নির্মাণ করা হচ্ছে। ইসলামিয় পোশাক পরে হরিনাম সংকীর্তন করা হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে কিছুই আর গোপন নেই। সোশ্যাল মিডিয়াতেই দেখা গেছে ধর্মান্তরিত ভারত বিখ্যাত গায়ক এ.আর. রহমানের বাড়িতে হরিনাম সংকীর্তন। আরব সুলতান, রাজকুমারদের মুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্বনি আওড়ানো হচ্ছে। জঙ্গি মানসিকতার জন্য সমগ্র বিশ্বে মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর সন্দেহজনক দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। চীন দেশের উরগুই প্রদেশে ইসলাম সম্প্রদায়ের ধর্ম কর্মের উপর সেদেশীয় অত্যাচারের কাহিনী আজ সর্বজনবিদিত। আরব দেশগুলি ছাড়া বিশ্বের অন্য কোনো ইসলামিক দেশের মুসলমান জনগণের জীবনযাত্রার মান মোটেই উন্নত নয়। কেন এমন হলো? আল্লাহর বান্দা হয়েও তারা কেন অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে, জ্ঞান-গরিমায় কেন পিছিয়ে?

একদল ধর্ম ব্যবসায়ী, রাজনীতির কারবারীরা মুসলমানদের ধর্মানুভূতিতে সুড়সুড়ি দিয়ে নিজেদের আখের গোছাচ্ছেন। সাধারণ মুসলমান জনতা বুঝতে পারছেন না। ধর্মবিদ্বেষী বক্তব্য দিয়ে ওয়াজের নামে একদল ধর্ম ব্যবসায়ী কোটি কোটি টাকা লুটে নিচ্ছেন। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশে এই ব্যবসা ভীষণভাবে চলছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের হাল আরও দিনকে দিন বেহাল হয়ে উঠেছে। ওদিকে ধর্মব্যবসায়ীরা বহাল তবিয়তে আধুনিক জীবনযাত্রা উপভোগ করছে। ধর্মকে হাতিয়ার করে যে সমস্ত নেতা-নেত্রী রাজনীতি করছেন তাদের সন্তান-সন্ততিরা বিদেশে বহাল তবিয়তে রয়েছে, আধুনিক এবং উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করছে। আর তাদের অনুগামীরা ধর্মের নামে জীবন দিচ্ছেন।

দুর্গোৎসবে মূর্তিপূজা হচ্ছে বলেই পূজার সময়গুলিতে কোটি কোটি টাকা লেন-দেন হচ্ছে। মূর্তির সাজসজ্জা থেকে প্যান্ডেল সজ্জা সর্বত্র কি শুধুই হিন্দু শ্রমিকেরা নিয়োজিত আছে? হিন্দুর ধর্মীয় উৎসবগুলিতে যে কোটি কোটি টাকার লেন-দেন হয় তাতে কী ইসলামপন্থীদের অর্থনীতিতে প্রভাব পড়ে না? ধর্মীয় উৎসব এখন শুধুমাত্র শাস্ত্রীয় ব্যাপার-স্যাপার নয়। বিরাট অর্থনীতির পট পরিবর্তন হয় এই ধর্মীয় কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে। হিন্দু বিদ্বেষী বাংলাদেশেও দেখা যায় ছোটো ছোটো মুসলমানদের কুটির শিল্পীরা হিন্দুদের পূজার উপকরণ গ্রামে গ্রামে ফেরি করেন বা হাটে বাজারে বসে বিক্রি করেন। পশ্চিমবঙ্গেও হামেশাই এ চিত্র দেখা যায়।

বছরে ৩৬৫ দিন পাঁচবার উচ্চস্বরে আজানের শব্দ যখন বিধর্মীরা সহ্য করতে পারেন, তখন বছরে মাত্র পাঁচটা দিন বিধর্মীদের প্যান্ডেলের সঙ্গীত (যে সঙ্গীত আবার হয়তো কোনো মুসলমানের লেখা বা সুরে বা যন্ত্রসঙ্গীতে প্রস্তুত এবং সেখানেও প্রচুর টাকার লেন-দেন হয়েছে) মুখ বুজে সহ্য করে নেওয়ায়ই শ্রেয়। সুজলা সুফলা পশ্চিমবঙ্গ যদি শরিয়তির খপ্পরে পড়ে আর একটা আফগানিস্তান, পাকিস্তান বা বাংলাদেশ হয়ে ওঠে অর্থনীতিটাও কিন্তু ওদের মতোই হয়ে যাবে। ওই দেশের জনগণের মতোই এদেশের জনগণও দুর্ভোগ করবে। তাই সাধু সাবধান। □

# ভারত এবং হিন্দু বিদ্বেষে ভাসছে বাংলাদেশ

**রঞ্জন কুমার দে**

বাংলাদেশে স্বৈরাচারী হাসিনার পতন ঘটিয়ে হয়েছে আরেক বেলাগাম উশৃঙ্খল শাসন ক্ষমতার। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে বাংলাদেশে অন্তবর্তী সরকার প্রতিষ্ঠা হলেও এরপর থেকে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িকতার ঘোর অরাজকতা যেটার কাছে তালেবানি বর্বরতাও হার মানাবে। হাসিনার দেশত্যাগের মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আওয়ামি লিগ অনেক নেতা ও পুলিশদের জ্যান্ত পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে নতুবা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মাঝ রাস্তায় দিনদুপুরে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিবারের মতো সংখ্যালঘু নিপীড়নে কোনো প্রকার খামতি দেওয়া হয়নি, দেশের এই নৈরাজ্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কোনো প্রকার মিডিয়ায় আসতে দেওয়া হচ্ছে না। উলটে এই মিডিয়াগুলো উঠে পড়ে লেগেছে কীভাবে বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়নের চিত্র গুজবে পরিণত করা যায়। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকের কল্যাণে ওদের সকল প্রকার চক্রান্ত ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে। তাই দেওয়ালে শেষ পিঠ ঠেকিয়ে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা প্রায় সব রাজপথে বেরিয়ে এসে প্রতিবাদে বাধ্য হলো। এই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অনেক হিন্দু ছাত্র শহীদ হলেও মিছিলে মিটিঙে আওয়াজ উঠছিল 'ভারত যাদের মামার বাড়ি, বাংলা ছাড়ো তাড়াতাড়ি', 'পেতে চাইলে মুক্তি, ছাড়ো ভারত ভক্তি'ইত্যাদি। তাই সংখ্যালঘুরা এইবার রাজপথে এসে পালটা দিচ্ছে, 'কথায় কথায় বাংলা ছাড়, বাংলা কি তোর বাপ-দাদার'। এই ছাত্র আন্দোলন শুধু হাসিনার একনায়কত্বের বিরুদ্ধে স্ফুলিঙ্গ বললে ভুল হবে, প্রকৃতপক্ষে সেটা ছিল ভারত এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে বরফাকৃতির জমানো বিদ্বেষ এবং ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ড. আসিফ নজরুল হাসিনা সরকারের উপর আরোপ করে আসছিলেন বাংলাদেশে নাকি ২৬ লক্ষ ভারতীয় সরকারি চাকরি করে আসছিলেন। যদি এই ভারত বিদ্বেষী লোকটার মন্তব্য সত্যিও ধরে নিই তাহলে সেই নম্বরটা ১৬ কোটির বাংলাদেশের মাত্র ১.৬ শতাংশ, যদিও সেখানে ৮ শতাংশের উপরে হিন্দুদের বসবাস। এই আসিফ বর্তমান সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকলেও এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পরেও এখন পর্যন্ত একজনও ভারতীয় সরকারি চাকরিজীবীদের খুঁজে বের করতে পারলেন না। কিন্তু অশিক্ষিত বাংলাদেশি মৌলবাদীরা এই গুজবাজের ২৬ লক্ষের টার্গেট সত্যি মনে করে অসংখ্য হিন্দু পুলিশ কর্মকর্তাদের জীবন্ত জ্বালিয়ে দিয়েছে। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার ভেতরে ৬৭ জন হিন্দু শিক্ষকদের পদত্যাগ করতে বাধ্য করানো হয়েছে, তবে সেই সংখ্যা শেষ পর্যন্ত ১০০-র গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছে। অনেক শিক্ষক শিক্ষিকাদের গলায় জুতার মালা পরিয়ে নতুবা গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল।

হাসিনার শাসনকালেও নারায়ণগঞ্জের প্রাক্তন সাংসদ সেলিম উসমান শ্রেণীকোঠায় ঢুকে এক হিন্দু শিক্ষিকাকে কানে ধরে উঠ-বস করিয়েছিল, ভাগ্যের পরিহাসে আজ সেই উসমান পরিবারও পলাতক। এটা ঠিক হাসিনার আওয়ামি লিগ হিন্দুদের জন্য কিছুই করেনি ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করা ছাড়া। কিন্তু হাসিনাকে পতন ঘটাতে হলে হিন্দু আর ভারত বিদ্বেষ ছাড়া বিরোধীদের কাছে তেমন কোনো বিকল্প খোলা ছিল না। ওদের ইলিশের দাম বেড়ে গেলেও ভারতের দোষ, বন্যাতে ডুবলেও সেই ভারত। আওয়ামি

লিগ-হিন্দু-ভারত বিদ্বেষ একই যুগসূত্রে গাঁথা এবং সেটার ভিত্তি বাংলাদেশ নামক নামটার জন্মলগ্ন থেকেই। কারণ ১৯৭১ সালে যদিও বাংলাদেশ স্বাধীনতা পেয়েছিল কিন্তু সেটার বিরোধী ছিল অধিকাংশ মৌলবাদী জামাত-পন্থী মানুষ, কিন্তু অগ্নিকন্যা ইন্দিরা গান্ধীর আশীর্বাদে শুধু বাংলাদেশ স্বাধীন হতে পেরেছিল। তাই এরপর থেকেই রাতের পর রাত ওয়াজে মজলিসে চলে আসছিল ভারত এবং হিন্দু বিরোধী প্রোপাগাণ্ডা। কিন্তু শেখ হাসিনা বা তার দল কোনোদিন সেই ভারত এবং হিন্দুদের প্রতি নিজের দায়বদ্ধতা পালন করে কৃতজ্ঞতাবোধ দেখাতে পারেনি, বরং তিনি সেই মোল্লা তেঁতুল হুজুরদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন 'কৌমি মাতা'র সম্মান। এতো বছর শেখ পরিবার হিন্দু এবং ভারতের আশীর্বাদে ক্ষমতায় থাকলেও হিন্দুদের জন্য ন্যূনতম সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয়, সংখ্যালঘু কমিশন এমনকী হিন্দুদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব দুর্গা পূজার জন্য মাত্র তিন দিনের ছুটি মঞ্জুর করে যেতে পারেনি কিন্তু দেশের প্রতিটি কোণায় কোণায় ৩৬৪১টি মডেল মসজিদ ঠিকই বানাতে পেরেছে।

আর আজ এই মৌলবাদীরাই বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য গুঁড়িয়ে দিয়ে বলছে— 'দড়ি ধরে মারো টান, মূর্তি করো খান খান'। যাইহোক হিন্দুদের জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রায় গায়ে সওয়া হয়ে গেছে, অনেকটা বাৎসরিক উৎসবের মতো সেটা ৪৭ সালেরই হোক বা ৭১, কিংবা নোয়াখালি দাঙ্গা। তাছাড়াও এখন প্রতিদিন দেশের আনাচে কানাচে কোনো না কোনো সংখ্যালঘু নির্যাতন চলেই আসছে। ১৯৭১-এর পর হিন্দুরা বাংলাদেশে সবচেয়ে সাম্প্রদায়িক হিংসার শিকার হয়েছিল ১৯৯২ সালে ভারতের বাবরি মসজিদ বিতর্কে, এরপর ২০০১ সালে যখন খালেদা সরকারের প্রত্যাবর্তন হয় সারাদেশ মেতে উঠেছিল সংখ্যালঘু হত্যা, ধর্ষণ, জমি দখলের বিভৎস চিত্রে। পরবর্তীতে হাসিনা সরকার ২০০৯ সালে মহম্মদ সাহাবুদ্দিনকে চেয়ারম্যান (বর্তমান রাষ্ট্রপতি) করে এক বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠিত করা হয়েছিল ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিচারের স্বার্থে। কমিশন যাচাই বাছাই করে প্রায় ২৫ হাজার অভিযোগ গ্রহণ করলেও একটারও বিচার হয়নি। ২০২১ সালের দুর্গা পূজায় যখন বাংলাদেশে একের পর এক মণ্ডপ মৌলবাদীরা গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল, হত্যা করা হয়েছিল মন্দিরের কর্তব্যরত কর্মীদের। সেই সময় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হাসিনার গোঁড়ামি যুক্তি ছিল পার্শ্ববর্তী দেশের সাম্প্রদায়িকতা এইসব ঘটনার জন্য দায়বদ্ধ। তাই হাসিনা পতনে হিন্দুদের এতো শোকপালনের কোনো যুক্তিই নেই।

যাইহোক, বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সংগঠনদের হিসাবানুযায়ী হাসিনা পতনের এক মাসে দেশে কম করেও ৫২টি জেলায় ২৭৮টি সংখ্যালঘু নিপীড়নের তথ্য উঠে এসেছে। তৎকালীন দেশটির স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হাত জোড় করে সংখ্যালঘুদের কাছে সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা চেয়েছিলেন, সম্ভবত দেশটির ইতিহাসে এরকম প্রথমবার হয়েছে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর স্পষ্টবাদিতার জন্য তাঁকে এরা দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে এরা মানতেই চায় না দেশের সংখ্যালঘুদের উপরে কোনো হামলা হয়।

একটি কুচক্রী মহল সর্বদা এই ঘটনাগুলোকে 'গুজব' আখ্যা দিয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টায় থাকে। প্রধানমন্ত্রী মোদী যখন বাংলাদেশ তত্ত্বাবধায়ক সরকার-প্রধান ইউনুসমহম্মদকে ফোন করে দেশের সংখ্যালঘুদের জীবন সুনিশ্চিত করতে অনুরোধ জানান তখন এই মহাশয় জানান —হিন্দুদের উপর অত্যাচারের ঘটনাগুলো অতিরঞ্জিত এবং ভারতীয় মিডিয়াগুলোকে ঘটনাস্থলে আসার আহ্বান জানান। অথচ এই ইউনুসই বলছেন, 'এমন সমাজ গঠন করবো, যাতে মন্দির পাহারা দিতে না হয়'। তাহলে তো স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে মন্দির তাহলে কেন পাহারা দিতে হচ্ছে? কারা মন্দির আক্রমণ করছে? নিশ্চয় কোনো ভূত নয়! □

# ‘এক দেশ-এক নির্বাচন’ ব্যবস্থায় কমবে হয়রানি, হবে অর্থের সাশ্রয়

**অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়**

‘দাদা আমার ফ্ল্যাটের ট্যাক্সটা কত মাস বাকি পড়েছে?’ ‘আগের বছর জমির খাজনা দিয়েছিলাম। এই বছরের খাজনার টাকাটা জমা করা যাবে?’ ‘আমার বার্ধক্য ভাতার টাকাটা এমাসে এখনও আসেনি। কবে নাগাদ পেতে পারি?’ ‘এখন আধার কার্ড আপডেট করা যাবে?’— সরকারি অফিসগুলিতে, বিশেষত পঞ্চায়েত, পুরসভা, ভূমি দপ্তর (বিএলএলআরও), রেশন অফিস, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ডাকঘর বা ব্যাংকে, এ এক অতি পরিচিত ছবি। কেন্দ্রের বা রাজ্যের ভোট এলেই সর্বত্র এক উত্তর— ‘এখন ভোটের প্রস্তুতি চলছে। কর্মীরা ভোটের ডিউটিতে গিয়েছেন। ভোট মিটলে এসে খোঁজ নিন’।

নির্বাচন ঘোষণা হলেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি অফিসগুলিতে শুরু হয়ে যায় একটু অন্য ধরনের তৎপরতা। সরকারের রুটিন কাজকর্ম বন্ধ হয়ে শুরু হয় নির্বাচনী প্রস্তুতিপর্ব। কর্মচারীদের প্রশিক্ষণপর্ব, ভোটগ্রহণ, ভোটগণনা, ফলপ্রকাশ। সরকারি দপ্তরগুলি হয়ে পড়ে প্রায় কর্মচারীশূন্য। জনপরিষেবা শিকেয় ওঠে। সাধারণ মানুষের হয়রানি চরমে পৌঁছায়। জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি সম্পর্কে মানুষের অভাব-অভিযোগের নিষ্পত্তি চলে যায় বিশ বাঁও জলে। উন্নয়নমূলক সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সব ধরনের ওয়ার্ক অর্ডার বেরোনো স্থগিত থাকে। যাকে বলে ‘ভোট বড়ো বালাই’! দেশে গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখার একটা চড়া দাম প্রতিবার ভোট এলে দিতে হয় সাধারণ মানুষকে। কোনো এলাকায় কোনো বড়ো অপরাধমূলক ঘটনা ঘটলে, রাস্তাঘাট-সেতু ইত্যাদি ভেঙে গেলে, বিদ্যুৎ পরিষেবা বিপর্যস্ত হলে, গ্রীষ্মকালীন পানীয় জলের সংকট দেখা দিলে, অতিবর্ষণে জলনিকাশির সমস্যা বা নদীভাঙন উপস্থিত হলে— তার মেরামতি বা সরকারি প্রতিকার তখন দূর অস্ত। এক কথায় সমস্ত প্রশাসন তখন স্তব্ধ। আদালতগুলিতে কাজকর্মও বন্ধ।

এর উপরে ভোট চলাকালীন রাজ্য জুড়ে শোনা যায় ভারী বুটের পদধ্বনি। বিশেষ করে ভোট সন্ত্রাসের ইতিহাস থাকা এলাকাগুলিতে ভোট ঘোষণার পর থেকেই টহলদারি চলতে থাকে কেন্দ্রীয় আধা-সামরিক বাহিনীর। স্থানীয় স্কুল-কলেজগুলি অস্থায়ীভাবে হয়ে ওঠে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আবাসস্থল। পঠন-পাঠন স্বাভাবিকভাবেই থাকে বন্ধ। এই পরিস্থিতিতে ব্যাহত হয় ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা। অনেক সময় তাদের পরীক্ষা যায় পিছিয়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের ভোট বা সাধারণ নির্বাচন আয়োজন করতে খরচ হয় বিপুল পরিমাণ অর্থ। লোকসভার এই নির্বাচন ছাড়াও রাজ্য সরকারগুলি গঠনের লক্ষ্যে বিধানসভা নির্বাচনগুলি আয়োজন করতেও বিপুল বাজেট বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। সময়ের সঙ্গে সেই ব্যয় নিরন্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। লোকসভা নির্বাচন ছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যে বিধানসভা, পুরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচন আলাদা আলাদা সময়ে অনুষ্ঠিত হতে থাকলে রাজ্যগুলিতে ভোটগ্রহণ পর্ব কার্যত ‘বারো মাসে তেরো পার্বণে’ পর্যবসিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছরেই কোনো না কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই উপলক্ষ্যে এই রাজ্যের সাধারণ মানুষের দুর্দশা চরমে পৌঁছায়।

দেশে পাঁচ বছর অন্তর একত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের ভোটগ্রহণ হলে বা কেন্দ্র-রাজ্য সরকার নির্বাচন একযোগে অনুষ্ঠিত হলে বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ সাশ্রয় সম্ভব। সরকারি অর্থ মানে তা হলো করদাতাদের টাকা। বার বার ভোট মানে সেই অর্থের অপচয়। অর্থ সাশ্রয় করা সম্ভব হলে দেশজুড়ে উন্নয়নযজ্ঞ গতি পাবে। জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির বাজেট বরাদ্দও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে। কমবে জনপরিষেবা থেকে বঞ্চিত সাধারণ নাগরিকদের হয়রানি। স্কুল-কলেজগুলিতে পঠন-পাঠন থাকবে অব্যাহত। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বাধীন কমিটির তরফে বর্তমান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে জমা দেওয়া রিপোর্টে যে প্রক্রিয়ায় কেন্দ্র-রাজ্যের ভোট একযোগে আয়োজন সম্ভব, সেই বিষয়ে বিস্তারিত সুপারিশ করা হয়েছে। লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন ছাড়াও স্থানীয় প্রশাসন, অর্থাৎ, পঞ্চায়েত-পুরসভার ভোটও সব রাজ্যে একত্রে আয়োজন করার বিষয়টিও এই রিপোর্টে তুলে ধরা হয়েছে। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে নির্বাচনী সংস্কারের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে সংবিধান-সংশোধনী বিল আনলে সংসদীয় পদ্ধতিতে তা হয়তো যৌথ সংসদীয় কমিটি বা জেপিসিতে পাঠানো হবে।

কারণ ভারতীয় নির্বাচনী ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ এই সংস্কার সাধন করতে হলে প্রয়োজন সরকার ও বিরোধীদের ঐক্যমত্য। লোকসভা ও রাজ্যসভায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পাশ হলে এই সংক্রান্ত সংবিধান- সংশোধনী আইনে পরিণত হবে। ‘জিএসটি আইন’ ছিল ভারতীয় অর্থনীতি ও কর-কাঠামোর ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সেই সংস্কারের লক্ষ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজীর নেতৃত্বধীন সরকারের উদ্যোগে শাসক জোট এনডিএ এবং সব বিরোধী দলগুলির মধ্যে সহমতি স্থাপনের প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। ১৯৫২ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত দেশজুড়ে বলবৎ ছিল ‘এক দেশ-এক নির্বাচন’ ব্যবস্থা। আগামীদিনে সংসদের অধিবেশনগুলিতে কেন্দ্রের উদ্যোগে কীভাবে এই ব্যবস্থা পুনরায় বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক ও আইনি প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে তার দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে দেশবাসী। ◻

## ‘মন কি বাত’ নিয়ে কিছু কথা

সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি অনুষ্ঠান। এখানে প্রধানমন্ত্রীজী দেশের অর্থনীতি, পরিকল্পনা, দেশের নানান সমস্যা, ঐতিহ্য, পরম্পরা, ইতিহাস, দেশাত্মবোধ তুলে ধরেন। রেডিয়োয় সম্প্রচারিত আকাশবাণীর এই অনুষ্ঠানটি শোনার জন্য দেশের রাষ্ট্রবাদী জনতার মধ্যে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। দেশের রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা, কর্মী ও সমর্থকরা প্রতি মাসের শেষ রবিবার অনুষ্ঠানটি শোনেন। অনুষ্ঠানটির প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে রাজ্য থেকে মণ্ডল স্তর পর্যন্ত গৃহীত হয় নানা কর্মসূচি, কিন্তু কিছু এলাকায় সম্প্রতি একটু ভিন্ন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। আগ্রহভরে অনুষ্ঠানটি শোনার চেয়ে দলীয় নির্দেশ পালনের বিষয়টি কিছু লোকজনের কাছে হয়ে উঠছে যেন মুখ্য। প্রধানমন্ত্রীর মূল্যবান বক্তব্য শোনার চেয়ে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের ফটো তুলে জেলা ও রাজ্যতে পাঠাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন কিছু কার্যকর্তা ও সমর্থক। অনুষ্ঠানটি মন দিয়ে না শুনে, প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের মর্ম উপলব্ধি না করে, নামমাত্র উপস্থিতির মাধ্যমে ফটো তুলে দলের উপর মহলে পাঠিয়ে দায়িত্ব পালন করছেন কতিপয় সমর্থক। কিছু জায়গায় কর্মীরা অনুষ্ঠান শুনলেও অন্য কয়েকজনের মনোযোগ হয়তো অনুষ্ঠানের প্রতি নেই। অনুষ্ঠান চলাকালীন তারা নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপ চালিয়ে যান। রেডিয়োয় সম্প্রচারিত এই অনুষ্ঠানটি জনপ্রিয় এবং এর গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু হাতে গোনা কিছু মানুষ, কিছু তথাকথিত সমর্থকদের এই ধরনের ভাবসাব ইদানীং কিছু জায়গায় দেখা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের মানুষ হিন্দি ভাষা সেভাবে বুঝতে পারে না। তাঁদের অনেকেই (সকলেই নয়) রেডিয়োয় সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানটির শ্রোতা হলেও প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের অর্থ ঠিক ধরতে পারেন না। এই কারণে আমার মনে হয় এই অনুষ্ঠানটি ডাবিং করে প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব মাতৃভাষায় প্রচার করা উচিত। তাতে ভাষাগত দূরত্ব ঘুচে যাবে। প্রধানমন্ত্রীজী কী বললেন, তা মানুষ পরিষ্কার করে বুঝতে পারবে এবং স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হবে। বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর একটু ভাবনাচিন্তা করলে ভালো হয়। একজন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে আমি এই আবেদনটি তুলে ধরলাম।

—**কাশীনাথ সাহা,**
**গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর।**

## মদ ও মদ্যপান নিষিদ্ধ হোক

একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রকাশ যে মদ্যপানে আগ্রহ হারিয়েছে বর্তমান প্রজন্মের একটি বড়ো অংশ। এটা যে অত্যন্ত খুশির খবর তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে বর্তমান প্রজন্মের একটি অংশ শরীর ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। মদ্যপানের কুফল সম্পর্কে তারা অবহিত হওয়ার কারণে বর্তমান প্রজন্মের এই অংশটি মদ্যপান থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখছে।

বর্তমানে ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা মদ্যপানের কুফল সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। বর্তমান প্রজন্ম টেকস্যাভি হওয়ার কারণে তারা অনেক কিছুই জানতে পারছে। পূর্ববর্তী প্রজন্মের যে অংশ মদ্যপান করত, তাদের ভবিষ্যৎ দেখে তারা মদ্যপান থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়েছে। মদ্যপানের বদলে তারা বিভিন্ন জায়গাতে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে।

একথা প্রমাণিত সত্য যে মদ্যপান মানুষের শরীরের পক্ষে এবং সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। মদ্যপানের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোনো বড়ো সামাজিক আন্দোলন সংগঠিত না হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান প্রজন্মের একটা বড়ো অংশ নিজেদের উদ্যোগে মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার জন্য মদ্যপান থেকে নিজেদেরকে বিরত রেখে এক নতুন উদাহরণের সৃষ্টি করেছে। আমাদের দেশ থেকে মদ্যপানকে নিষিদ্ধ করবার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে উদ্যোগী হওয়ার জন্য আবেদন রাখছি। বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার সুরাপ্রেমীদের থেকে একটা বড়ো অংশের ট্যাক্স পায় কিন্তু দেশের স্বার্থে, দেশের যুবসমাজের স্বার্থে আমাদের দেশ থেকে মদকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন।

মনে রাখতে হবে মদ্যপান ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী। দেশের যুবসমাজের যে বড়ো অংশ নিজে থেকেই মদ্যপানের বিরুদ্ধে নিজেদেরকে সচেতন করেছে, সেখানে দেশের সমস্ত মানুষের স্বার্থে মদ্যপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। আশা রাখি রাষ্ট্রবাদী কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় নাগরিকদের স্বার্থে অতি শীঘ্রই মদ্যপানকে এবং মদ বিক্রিকে দেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করবে।

দেশের যুবসমাজের দেখানো পথেই এদেশ থেকে মদ চিরতরে বিলুপ্ত হবে।

—**কুন্তল চক্রবর্তী,**
**খয়রামারী, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরগনা।**

## ‘অল আইজ অন হিন্দুজ অফ বাংলাদেশ’

গত ৫ আগস্টের পর বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর গত ৮ আগস্ট হতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদে আসীন হয়েছেন সমাজসেবী, নোবেল বিজয়ী ড. মহম্মদ ইউনুস। তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করলেও বাংলাদেশ জুড়ে জারি রয়েছে প্রবল অচলাবস্থা। শাসনভার বকলমে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর হাতে থাকলেও সংখ্যালঘুদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় তারা পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়। ৩৪টি থানা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে বিভিন্ন সংবাদসূত্রে খবর। ৪৫০-রও বেশি পুলিশকর্মী জামাতি জঙ্গিদের হাতে নিহত হয়েছেন। ৫ আগস্টের পর থেকে বাংলাদেশ জুড়ে প্রবল হয়েছে

ফঃ ৩

হিন্দু নির্যাতন। জেহাদিদের হাতে প্রায় ৫০০ জনেরও বেশি হিন্দু নিহত হয়েছে, অসংখ্য হিন্দু মহিলার সম্ভ্রমহানি ঘটেছে। অগণিত মানুষ এখনও নিখোঁজ। বহু মানুষের ঘর-বাড়ি, দোকান ভাঙচুর, লুঠ ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। নেত্রকোণার ইসকন মন্দির-সহ অসংখ্য মঠ-মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে। ঢাকা ডিভিশনের অন্তর্গত ধামরাইয়ের রথযাত্রা বিখ্যাত। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনা সেই রথটিকে ধ্বংস করে। গত ৫ আগস্টের পর সেই রথটিকে ফের ধ্বংস করা হয়েছে বলে খবর। জামাত ও হেফাজতের তরফে দাবি তোলা হয়েছে বাংলাদেশের নাম পাল্টে পূর্ব পাকিস্তান বা ইসলামিক বাংলাস্তান রাখতে হবে। মানুষের তৈরি আইন বা সংবিধানের পরিবর্তে বাংলাদেশে শরিয়তের শাসন বলবৎ করতে হবে। বাংলা ভাষার পরিবর্তে জাতীয় স্তরে আরবি ও উর্দু— এই দুটি ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গানের পরিবর্তে ফার্সি ভাষায় নতুন জাতীয় সংগীত রচনা করতে হবে। ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিয়োতে জেহাদি-মনোভাবাপন্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বলতে শোনা যায় যে তারা সবাই বাবর হবে এবং তারা ভারত দখল করবে।

গত ২৫ আগস্ট এই তথাকথিত ছাত্রদেরই সংগঠন— 'অধিকার সচেতন শিক্ষার্থী সমাজ'-এর তরফে একটি প্রেস রিলিজ জারি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শরিয়তি আইন মোতাবেক হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-উপজাতি সকল শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের বোরখা-হিজাব-নিকাব পরার নির্দেশও জারি করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি অফিস, আদালতগুলিতে কর্মরত হিন্দু অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সরকারি আধিকারিক ও কর্মচারীদের জীবন সেই দেশে বিপন্ন। হিন্দু হওয়ার অপরাধে প্রায় ৮০-জনেরও বেশি অধ্যাপক, শিক্ষক ও কর্মচারীদের থেকে এখনও পর্যন্ত জোর করে ইস্তফাপত্র লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে। বহু এলাকায় বাঁচিয়ে রাখার শর্তে জামাতের তরফে হিন্দুদের থেকে জিজিয়া কর আদায় চলছে। জেহাদিদের দ্বারা ব্যাপক ভাবে চলছে হিন্দুদের জায়গা-জমি দখল। সম্প্রতি ঢাকা-স্থিত ভারতীয় হাইকমিশন ঘেরাও করে উন্মত্ত জেহাদিরা সেখানে ভিসা দানের কেন্দ্রগুলি বন্ধ করার হুমকি দেয়। কেন্দ্রগুলি বন্ধ না হলে ভারতীয় হাইকমিশন অফিস জ্বালিয়ে দেওয়া হবে বলে তারা স্লোগানও দেয়। বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে সনাতন জাগরণ মঞ্চের আহ্বানে গত ২৫ অক্টোবর চট্টগ্রামে একটি সভা আয়োজিত হয়। সেই সভায় বিপুল জনসমাগম হওয়ার পর সভার অন্যতম উদ্যোক্তা, ইসকনের সন্ন্যাসী প্রভু চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী মহারাজের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছে। এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক মহল ও ভারত সরকারের তরফে সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ বিশেষ প্রয়োজনীয়। ১৯৭১ সালের সঙ্গে সমতুল্য এই শোচনীয় পরিস্থিতি থেকে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উদ্ধার করতে সব পক্ষের একজোট হওয়া হলো বর্তমান সময়ের দাবি।

**—অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়,**
**খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা।**

# বাংলাদেশে সাধুসন্তদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা

বাংলাদেশে শ্রী চিন্ময় প্রভু এবং তাঁর সঙ্গে আরও ১৮ জনের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা দায়ের হয়েছে। মামলার বাদী মোহাম্মদ ফিরোজ খান, ৪৯ চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম। বাদীর সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি। কোতয়ালি থানার মোহাম্মদ ফজলুল কাদের চোধুরী গত ৩১ অক্টোবর ভোর ৫টায় বাদীর এজাহার গ্রহণ করেন। তিনি রিপোর্টে লেখেন— 'বাদীর কম্পিউটারে টাইপ করা এজাহার মামলা নং ৫২, তারিখ ৩১ অক্টোবর, ২০২৪ ধারা ১২০-খ/ ১২৪-ক/ ১৫০-ক/ ১০৯/৩৪ পেনাল কোড রুজু করা হইলো'।

মামলার বিবাদীরা হচ্ছেন: (১) চন্দন কুমার ধর প্রকাশ চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, বয়স: ৩৮, (২) অজয় দত্ত, বয়স: ৩৪, সমন্বয়ক হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, চট্টগ্রাম, (৩) লীলা রাজ দাস ব্রহ্মচারী, বয়স: ৪৮, (৪) গোপাল দাশ টিপু, বয়স: ৩৮, (৫) ডাঃ কথক দাশ, বয়স: ৪০, (৬) প্রকৌশলী অমিত, বয়স: ৩৮, (৭) রনি দাশ, বয়স: ৩৮, (৮) রাজীব দাশ, বয়স: ৩২, (৯) কৃষ্ণ কুমার দত্ত, বয়স: ৫২, (১০) জিকু চৌধুরী, বয়স: ৪০, (১১) নিউটন দে ববি, বয়স: ৩৮, (১২) তুষার চক্রবর্তী রাজীব, বয়স: ২৮, (১৩) মিঠুন দে, বয়স: ৩৫, (১৪) রুপন ধর, বয়স: ৩৫, (১৫) রিমন দত্ত, বয়স: ২৮, (১৬) সুকান্ত দাশ, বয়স: ২৮, (১৭) বিশ্বজিৎ গুপ্ত, বয়স: ৪২, (১৮) রাজেশ চৌধুরী, বয়স: ২৮, (১৯) হৃদয় দাস, বয়স: ২৫।

বাদী তার দায়ের করা অভিযোগে বলেছে যে গত ২৫ অক্টোবর লালদিঘি ময়দানে সমাবেশের প্রাক্কালে আসামিরা কোতয়ালি থানার নিউ মার্কেটস্থ জিরো পয়েন্ট স্তম্ভ এবং তার আশেপাশে শিক্ষার্থী বিপ্লবের টাঙিয়ে রাখা পতাকার উপর ইসকনের পতাকা ঝুলিয়ে দেয়, যা দেশের সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় পতাকার অবমাননার শামিল। এটি স্বাধীন দেশের অখণ্ডতাকে অস্বীকারের নামান্তর এবং দেশদ্রোহিতা। বাদী এতে শ্রেণীবিদ্বেষ এবং জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে।

বাদীর পরিচয়টা জানা প্রয়োজন ছিল, কারণ একজন সাধারণ নাগরিক দেশদ্রোহিতার মামলা করতে পারেন কিনা তা কারুর জানা নেই। ব্যারিস্টার সুমন কিছুকাল আগে প্রিয়া সাহার বিরুদ্ধে একটি মামলা করে, যা খারিজ হয়ে যায়। চিন্ময় প্রভু একটি ভিডিয়ো বার্তায় তাঁর অবস্থান ব্যাখ্যা করে বলেছেন— 'আমি গ্রেফতার হলেও আপনারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন'।

তিনি শক্ত আছেন বলে জানিয়ে চিন্ময় প্রভু বলেছেন যে ৩১ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার) -এর কর্মসূচি তিনি অব্যাহত রাখবেন। প্রভু বলেছেন যে তিনি না থাকলেও যাতে আন্দোলন অব্যাহত থাকে, সবাই যেন সেই চেষ্টা করেন। হিন্দুরা যে যেখানে থাকুন, বাংলাদেশ জুড়ে ভয়াবহ হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে সোচ্চার হোন।

**— শিতাংশু গুহ,**
**নিউ ইয়র্ক, আমেরিকা।**

# গৃহ ও গৃহলক্ষ্মী

**সুতপা বসাক ভড়**

আমাদের সমাজে গৃহস্থালির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। শাস্ত্র নির্দিষ্ট পথে চলতে গিয়ে দেখি আমরা গৃহস্থাশ্রমে বসবাস করছি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে আমরা করে চলেছি ধর্মময়, সেজন্য বলে থাকি সংসারধর্ম। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর জীবনলীলায় গাৰ্হস্থ্যধর্মকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। বিশ্বে যা কিছু নতুন, বৈচিত্র্যময়, সুন্দর সেগুলির সৃষ্টি হয়েছে গৃহস্থের সংসারে। আবার সংসার অথবা গৃহে বিরাজ করেন গৃহলক্ষ্মী। আমাদের সংস্কৃতিতে গৃহলক্ষ্মীর স্থান অনেক উঁচুতে। তাঁর স্থান চিহ্নিত হয়ে আছে অত্যন্ত মর্যাদা, সম্মান ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে। গৃহিণী সম্পর্কে মহাভারতে মহামতি ভীষ্ম বলছেন :

'ন গৃহম্ গৃহমিত্যায়ুঃ গৃহিণী গৃহমুচ্যয়েৎ

গৃহম্ কা গৃহিণীহীনম্ অরণ্যসদৃশম্ মতম্....।'

—অর্থাৎ, গৃহ বলতে ইট-কাঠ দিয়ে তৈরি ঘর বোঝায় না। গৃহিণীই হলেন গৃহের সৃজনকর্ত্রী। আমার মতে গৃহিণীবিহীন গৃহ অরণ্যসদৃশ।

ভারতীয় পরম্পরায় নারী অর্থাৎ গৃহলক্ষ্মী হলেন জ্ঞান এবং সমৃদ্ধির প্রতীক। মানবের প্রথম গুরু এবং পথপ্রদর্শিকা তিনি। আবার পরিবাররূপী এককের কুশল প্রবন্ধিকাও তিনি। তিনি দুটি কুল (পরিবার)-কে যুক্ত করেন। মনুসংহিতায় বর্ণিত হয়েছে :

'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।

যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলা ক্রিয়া।।' —মনু, ৩।৫৬

—যে গৃহে নারীগণ পূজিতা হন, সেই গৃহে দেবতাসকলও সানন্দে আগমন করেন, আর যে গৃহে নারীগণ বহুমান লাভ না করেন, সে গৃহে দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞাদি কোনো ক্রিয়াই সুফল প্রসব করে না। গৃহলক্ষ্মীরূপিণী নারী হলেন ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ গৌরবশালী এবং সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পরম্পরার পোষক, সংরক্ষক ও সংবর্ধক।

স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন— 'প্রাচীনকালে গৃহস্থ ব্যক্তির পত্নী ব্যতীত কোনো ধর্মানুষ্ঠানের অধিকার ছিল না— ধর্মকার্যের সময় পত্নী সঙ্গে সঙ্গে থাকা চাই— সেইজন্যই পত্নীর একটি নাম সহধর্মিণী, যাঁর সহিত একত্র মিলিত হইয়া ধর্ম কার্যানুষ্ঠান করিতে হয়। হিন্দু গৃহস্থকে শত শত প্রকার ধর্মানুষ্ঠান করিতে হইত, কিন্তু পত্নী সঙ্গে থাকিয়া উক্ত অনুষ্ঠানে তাঁহার কর্তব্যটুকু অনুষ্ঠান না করিলে, কোনো ধর্মানুষ্ঠানই বিধিমতো অনুষ্ঠিত হইল না।'

আমাদের পূর্বজরা জগতে গৃহ-লক্ষ্মীর মর্যাদা সর্বপ্রথম অনুভব ও প্রচার করেন। সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তীর মতো গৃহলক্ষ্মীরা ভারতে পদার্পণ করে এই দেশ পবিত্র করেছেন, পুণ্যময় ধর্মক্ষেত্রে পরিণত করেছেন। ভারতের মৃত্তিকা বুদ্ধেকপ্রাণা যশোধরা, চৈতন্যঘরণী বিষ্ণুপ্রিয়া, ধর্মপ্রাণা অহল্যাবাঈ, চিতোরের বীর গৃহলক্ষ্মীদের পাদস্পর্শে পবিত্র হয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্র থেকে পেয়েছি— 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি-যত্নতঃ'-কন্যাকেও পুত্রের মতো যত্নসহকারে পালন এবং শিক্ষাদান করতে হবে।

মহাভারতে আছে : 'নিত্যম্ নিবসতে লক্ষ্মীঃ কন্যাকাসু প্রতিষ্ঠিতা'— লক্ষ্মী কন্যাদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিতা হয়ে চিরকাল বাস করছেন। (১৩।১১।১৪)

কবি কালিদাস লিখেছেন : 'কন্যেয়ম্ কুলজীবিতম্'— (কুমারসম্ভব ৬।৬৩)— কন্যাই হলো পরিবারের প্রাণস্বরূপিণী।

বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে গৃহলক্ষ্মীর যে স্থান পারম্পরিক ভাবে সদাবিরাজমান, সেই স্থানকে স্বমহিমায় নিত্য অধিষ্ঠিত করার জন্য সকলের প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এটাই কাম্য কারণ আমরা জানি যে ভারত হলো একমাত্র প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রস্থল, যা আজও সগর্বে বহন করে চলেছে তার সংস্কৃতি, যা অতি প্রাচীন অথচ চির নবীন। □

# আলসারেটিভ কোলাইটিস ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

আলসারেটিভ কোলাইটিস হচ্ছে পেটের প্রদাহজনিত যন্ত্রণাদায়ক সমস্যা। এর ফলে কোলনে প্রদাহ ও ঘা হয় যা রোগীর পেটে ব্যথার সৃষ্টি করে। ছোটো ছোটো আলসার বা ঘাগুলো পুরো কোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আলসারগুলো একে অন্যের সঙ্গে মিলে গিয়ে বড়ো হতে থাকে—

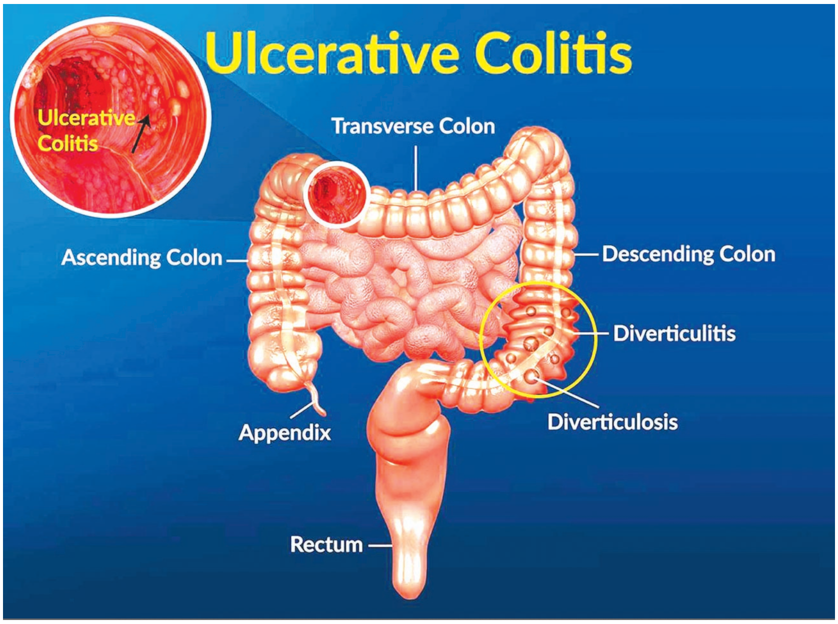


**আলসারেটিভ কোলাইটিস---উপসর্গসমূহ**

- পাতলা পায়খানার সঙ্গে রক্ত পড়া বা রক্ত আমাশয় হলো আলসারেটিভ কোলাইটিসের প্রধান লক্ষণ।
- রোগের তীব্রতা কম থাকলে দিনে মোটামুটি ৪/৫ বার পাতলা পায়খানা হতে পারে।
- পায়খানার সঙ্গে আমাশাও থাকতে পারে।
- মলদ্বার দিয়ে অনেক সময় মিউকাস বের হয়।
- পায়খানার বেগ আসা মাত্রই ছুটতে হয়।
- তল পেট মোচড় দেয় এবং অনেক সময় তীব্র পায়খানার বেগ হয়।
- সাধারণত তলপেটের বাম পাশে ব্যথা থাকে যা পায়খানা হওয়ার পর কিছুটা কমে যায়।
- পায়খানার সঙ্গে রক্ত যাবার ফলে রোগীর রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়।
- মলদ্বারে ব্যথা হতে পারে।
- অরুচি, অস্বস্তি হয়, ওজন কমে যেতে পারে।
- পেট ফেঁপে থাকা সম্ভব।
- পেট শক্ত হয়ে থাকে ইত্যাদি।

**আলসারেটিভ কোলাইটিস— কারণ**

আলসারেটিভ কোলাইটিসের নির্দিষ্ট কারণ এখনও অজানা। তবে করে যে সব কারণে রোগটি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি দেখা যায় সেগুলো হলো—

- জিনগত বা পারিবারিক ইতিহাস।
- অত্যধিক মানসিক দুশ্চিন্তা।
- অত্যধিক মশলাদার খাবার খাওয়া।
- অনিয়ন্ত্রিত অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ গ্রহণ।
- এনএসএআইডি ওষুধ অত্যধিক গ্রহণ।

**আলসারেটিভ কোলাইটিস---রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষা**

- রক্ত পরীক্ষা করলে হিমোগ্লোবিন কম দেখা যায় এবং ইএসআর বেশি দেখা যায়।
- সিগময়ডোস্কোপি।
- কোলোনোস্কপি।
- বেরিয়াম পরীক্ষা।
- আলট্রাসনোগ্রাফি।
- এমআরআই।

**আলসারেটিভ কোলাইটিস---জটিলতা**

সময় মতো চিকিৎসা না করলে বিভিন্ন জটিলতা আসতে পারে যদিও জটিলতাগুলি ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

- কোলন ক্যান্সার হতে পারে।
- কোমর, মেরুদণ্ড, হাঁটু, পায়ের গোড়ালি, হাতের জয়েন্টে ব্যথা হতে পারে।
- চামড়ার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের লাল ভাব দেখা যেতে পারে।
- চোখের বিভিন্ন ধরনের প্রদাহ হতে পারে।
- হাড়ের ক্ষয় (অস্টিওপোরোসিস) হয়।

**আলসারেটিভ কোলাইটিস—রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষা**

হোমিওপ্যাথি ছাড়া অন্যান্য চিকিৎসা শাস্ত্রে আলসারেটিভ কোলাইটিসের কোনো স্থায়ী চিকিৎসা নেই। লক্ষণ অনুযায়ী হোমিওপ্যাথি ওষুধগুলি ব্যবহার করলে স্থায়ী ফল পাওয়া যায়।

নাক্স ভমিকা, মার্ক সল, মার্ক কর, ফসফরাস, অ্যালো সকোট্রিনা, নাইট্রিক অ্যাসিড, কলচিকাম ইত্যাদি ওষুধ কার্যকরী।

তবে কখনই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। কারণ চিকিৎসক তার অভিজ্ঞতার আলোকে উপসর্গ মিলিয়ে নির্দিষ্ট ওষুধের শক্তি পরিমাপ করে প্রয়োজনীয় ওষুধটি নির্বাচন করে থাকেন। যা চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

# দেশের উন্নয়নের জন্য ‘এক দেশ এক ভোট’ জরুরি

**আনন্দ মোহন দাস**

সাম্প্রতিককালে ‘এক দেশ এক ভোট’ এই বিষয়টি রাজনৈতিক মহলে বেশ আলোড়ন তুলেছে। প্রসঙ্গত, এ বিষয়ে সব পক্ষের সঙ্গে বিশদভাবে আলোচনা করে সুপারিশের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে একটি বিশেষ সমিতি গঠন করেছিল। গত ২৩ সেপ্টেম্বর এই সমিতি সরকার ও রাষ্ট্রপতির কাছে ১৮০০০ পৃষ্ঠার একটি বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেছেন। তারপর থেকেই রাজনৈতিক দলগুলি প্রকাশ্যে পক্ষে বিপক্ষে মতামত দেওয়া শুরু করেছেন। কয়েকদিন আগে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট এই রিপোর্টটি অনুমোদন করেছেন। পরবর্তী পদক্ষেপ হলো সংসদে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিলটি পাশ করাতে হবে এবং কমপক্ষে বিলটির পক্ষে ৫০ শতাংশ রাজ্যের সমর্থন জরুরি রয়েছে। তবেই বিলটি আইনে পরিণত হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দেশে ২৮টি রাজ্য ও তার সঙ্গী দলগুলি মিলে এনডিএর দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। আগামী দিনে পরিষ্কার হবে কোনো রাজনৈতিক দল বিলটির পক্ষে এবং ‘এক দেশ এক ভোট’ প্রক্রিয়া লাগু করা যাবে কিনা। বলা বাহুল্য এক দেশ এক ভোট প্রক্রিয়ায় যুগপৎভাবে সারা দেশে একসঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ আমাদের দেশে প্রতিবছর পাঁচ ছয়টি নির্বাচন হয়েই থাকে। এই নির্বাচনগুলি সারা বছর ধরে চলতে থাকলে, এর পরিণাম খুব একটা ভালো হয় না বরং বেশ কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়।

১. বিপুল পরিমাণ নির্বাচনী খরচ, ২. নির্বাচনী মডেল কোড অনুযায়ী সমস্ত উন্নয়ন মূলক কাজের গতিরোধ, ৩. প্রশাসনের কর্মচারীদের নিজ বিভাগ ছেড়ে বারবার ভোটের কাজে যুক্ত হতে হয়, ৪. ভোটের শতাংশে হ্রাস পায়, ৫. সুরক্ষার জন্য নিরাপত্তা বাহিনীকে বারবার ব্যবহার করতে হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত সারা দেশে লোকসভা ও বিধানসভা ভোট একসঙ্গে হতো। তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার দ্বারা ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ সালে কতকগুলি বিধানসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ভেঙে দেওয়া হয় এবং ১৯৭০ সালে লোকসভার মেয়াদ আগে ভেঙে যায়। তার ফলে রাজ্য ও কেন্দ্রের নির্বাচনী নির্ঘণ্ট পরিবর্তিত হয়ে একসঙ্গে বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনের ধারাটি বদল হয়ে যায়। সারা দেশে পৃথক ভাবে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন করার জন্য প্রচুর খরচ হয়ে

থাকে। প্রচুর অর্থের অপচয় ঘটে কিন্তু ওই দুটি নির্বাচন সারা দেশে যুগপৎ ভাবে হলে অনেক খরচের সাশ্রয় হবে। এছাড়া যুগ্মভাবে নির্বাচনে সময়ের সাশ্রয় হয় এবং সরকার বারবার নির্বাচনী লড়াইয়ের সম্মুখীন না হয়ে পুরো পাঁচ বছর নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রশাসনিক ও উন্নয়নের কাজে মনোনিবেশ করতে পারে।

তথ্যসূত্রে জানা যায় ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন ও সমস্ত রাজনৈতিক দলের খরচ বাবদ প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা নির্বাচনী খরচ হয়েছিল। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে সুরক্ষা বাহিনীর নিযুক্তি ও স্থানান্তরের জন্য অতিরিক্ত পরিমাণ টাকা খরচ হয়ে থাকে। বারবার নির্বাচন হলে ভোটের দায়িত্ব পালন এবং এই সংক্রান্ত কাজের দায়িত্বের জন্য সরকারি প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিভাগ নিয়মিত কাজের পরিবর্তে নির্বাচনী কাজে ব্যস্ত থাকে। এর ফলে নিয়মিত সরকারি কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

একসঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন হলে খরচ যেমন অনেকটা কমবে এবং ভোটদানের হারও বৃদ্ধি পাবে। নির্বাচন কমিশন কোবিন্দ প্যানেলের কাছে জানিয়েছে যে ২০২৯ সালে একসঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন হলে আনুমানিক ৭৯৫১ কোটি টাকা খরচ হবে। এর ফলে অর্থের অপচয় অনেকটাই হ্রাস পাবে। তবে নির্বাচন কমিশনের কাছে চ্যালেঞ্জ রয়েছে বিশাল সংখ্যক ইভিএম মেশিন ও লজিস্টিক চাহিদা পূরণ করা। সাবা নিকোলেনি নামে একটি সংস্থা ১৯৭১ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে ভারতের ২৬০টি নির্বাচনের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে যখন রাজ্য ও কেন্দ্রের ভোট একসঙ্গে হয়, তখন গড়ে ৯.৯৪ শতাংশ বেশি ভোট পড়ে। সুতরাং এক দেশ এক ভোট হলে ভোট দানের হার বেশি হবে।

সেজন্য নির্বাচন কমিশন লোকসভা ও বিধানসভা ভোট একসঙ্গে সম্পন্ন করার জন্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে দাবি জানিয়ে আসছে। এমনকী 'ল' কমিশন ১৯৯৯ সালে তাদের ১০৭তম রিপোর্টে এবং ২০১৮ সালে ২২তম 'ল' কমিশন লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন যুগ্মভাবে করার জন্য সুপারিশ করেছে। এই বিষয়ে সমর্থকদের যুক্তি হলো, বারবার ভোট হলে রাজ্যের সম্পদের উপর চাপ পড়ে, রাজনৈতিক দলগুলিও সর্বদা প্রচারে ব্যস্ত থাকে এবং ভোটের জন্য দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে থাকে। আগামী দিনে মজবুত গণতন্ত্র, স্থিতিশীল অর্থনীতি, শক্তিশালী দেশ গঠন, আর্থিক অপচয় ও উন্নয়নের গতিরোধ রুখতে এক দেশ-এক নির্বাচনের প্রয়োজন রয়েছে। যদিও সমালোচকরা বলেন একটি ইভিএম মেশিনের জীবন মাত্র ১৫ বছর। এর ফলে তিনটি নির্বাচনের পর মেশিনগুলি বাতিল করতে হবে যা বিশাল খরচের ব্যাপার। তাঁরা আরও বলেন যে এক দেশ— এক ভোট হলে আঞ্চলিক দলগুলি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে এবং রাজ্য রাজনীতির উপর কেন্দ্রের প্রভাব বাড়বে।

এক দেশ এক ভোটের অনেক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বিরোধীরা বলেন গণতন্ত্র হরণ, স্থানীয় ইস্যুর উপর জাতীয় ইস্যুর প্রাধান্য এবং সাংবিধানিক সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। একথা অনস্বীকার্য লোকসভা ও বিধানসভা ভোট একসঙ্গে করতে হলে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সংসদে সংবিধান সংশোধন বিল পাস করাতে হবে এবং কমপক্ষে অর্ধেক রাজ্যকে সমর্থন করতে হবে। এছাড়া একদেশ এক নির্বাচন করার জন্য বেশ কিছু বিধানসভা বা লোকসভার মেয়াদ হ্রাস করার প্রয়োজন হতে পারে। বিধানসভায় অনাস্থা প্রস্তাবের পাশাপাশি আস্থা প্রস্তাব আনারও ব্যবস্থা রাখতে হবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। সেজন্য ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন বিশেষ করে আর্টিকেল ৮৩,৮৫(২) (বি), ১৭৪(২) (বি), ৩৫৬ এবং ৭৫(৩) সংশোধন করতে হবে। তাছাড়া ভোটের কাজে অসংখ্য ভোটকর্মী, ইভিএম মেশিন, সুরক্ষা কর্মী নির্বাচন কমিশনকে সুনিশ্চিত করতে হবে। এসব সত্ত্বেও এক দেশ এক ভোট হলে নির্বাচনী খরচ হ্রাস পাবে, নির্বাচনী আরণবিধির জন্য সরকারি কাজের বাধা কম হবে। এর ফলে উন্নয়ন বৃদ্ধি পাবে। নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যবহার কম হবে। সর্বোপরি এক দেশ এক ভোট হলে দেশ নির্বাচনমুখী না হয়ে উন্নয়নমুখী হবে। তবে বর্তমান সরকার চাইলেও সংসদে এই আইন পাশ করাতে তাদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। তাই আগামী শীতকালীন অধিবেশনে সরকারের পদক্ষেপের উপর আমাদের নজর রাখতে হবে।

# ‘একদেশ এক ভোট’ নতুন ভারত গঠনে আরও একধাপ উত্তরণ

**ড. রাজলক্ষ্মী বসু**

২০০৯-এর সাধারণ নির্বাচনের এক ঘটনা বলি। সেবার মোট বুথ ছিল ৮৩৪,৯৯৯টি। যার মধ্যে একটা বুথ হলো বানেজ গ্রামে। যা গুজরাটে জুনাগড় জেলার। খুব অন্যরকম ছিল সেই একটা বুথ। প্রথমত, সিংহ অভয়ারণ্যের মধ্যে একমাত্র বুথ সেটি। দ্বিতীয়ত বুথটিতে মোট ভোটার সংখ্যা ১। হ্যাঁ, একজন। ভারতের নির্বাচনের ইতিহাসে এই প্রথম ঘটনা যেখানে মন্দিরের একজন পূজারির জন্য একটা বুথ নির্মাণ। কারণ মন্দির তিনি ছেড়ে যাবেন না। এবার ভাবি, লোকসভা, বিধানসভা, পঞ্চায়েত— যতবার ভোট ততবার ওই একটা বুথ গড়তেই হবে। একজনের জন্য একটা বুথ করতে কত ব্যয়। হিসেব করাই যাবে সেই ব্যয় থেকে যতবার বারে বারে ভোট হয়, বুথ হয়, তাতে কী বিপুল ব্যয়। ব্যয় কেবলমাত্রই সরকারি অর্থের নয়। সময়। মানবশ্রম। মনের শ্রম। রাজনৈতিক শ্রম। অতি অবশ্যই সবার ওপর প্রশাসনিক পরিকাঠামো পরিকল্পনা ও প্রয়োগ এক নিবিষ্ট পদ্ধতিগত ব্যয়। যতবার ভোট ততবার সেই তথাকথিত সব ঝঞ্ঝাটের মোকাবিলা। ততবার সেই রাজ্য, সেই অঞ্চলে ভোট হাওয়া। যা কখনও ঘূর্ণিঝড়, কখনও নিম্নচাপের মতো গুমোট থমথমে। কখনও তপ্ত ঝাঁঝরা করা তেজ হাওয়া। সেই আঞ্চলিক হাওয়া বারবার ভোট প্রক্রিয়া এবং কোন ভোট হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে বদল হয়। সেই হাওয়ার ওপর এক একটা অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক হাওয়ারও হেরফের করে। সোজাসাপটা বললে— যতবেশি ভোট ততবেশি জটিলতা। স্বাভাবিক কর্মজীবনে প্রতিবন্ধকতা, কখনও কখনও পরিস্থিতি সাপেক্ষে অতিষ্ঠ মানুষের জীবন।

> **নিন্দুক রাজনৈতিক দল স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যে যতবার অসাংবিধানিক বলবে ততবার প্রতিষ্ঠিত হবে এই প্রস্তাব কেবলমাত্রই সংবিধানমুখী নয়, তা জনমুখী ও প্রশাসনমুখী।**

যদি আমরা হিসেব করি তবে দেখব প্রতি বছরই কোনো না কোনো রাজ্যে বা একাধিক রাজ্যের বিধানসভার দামামা বাজে। চলে তুমুল রাজনৈতিক তরজা লড়াই। শুরু হয়ে যায় নির্বাচন বিধির বাঁধন। আরও হাজারটা খুঁটিনাটি বিষয় প্রদেশ এবং অঞ্চলভেদে সংযোজন হয়। যেমন, কোন রাজ্যে কখন বোর্ড পরীক্ষা। তাকে যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে ভোট করা। কখনো কোথাও বর্ষা, কখনো প্রবল খরা। এর মধ্যে আবার বাড়তি উত্তেজনা— এতদিন হয়ে গেল নির্বাচন কেন হবে না। কেয়ার টেকার সরকার একটা লবডঙ্কা।

অবিলম্বে ভোট চাই— সরকার গঠন চাই। যেই ভোটের দিনক্ষণ ভাবা হচ্ছে অমনি চলে এল কয়েকটা আঞ্চলিক নির্বাচনের নির্ঘণ্ট। এবার কোনটা আগে হবে। খুব চিন্তার বিষয়— কোনটা আগে? বিধানসভা নাকি পৌরসভা নির্বাচন। কেন একি নতুন নাকি? পশ্চিমবঙ্গেই তো এই সঙ্কট চলেছিল ২০২০ নাগাদ। পুরসভাগুলো তখন মেয়াদ শেষে ধুঁকছে। পরিষেবা লাটে উঠেছে। করোনা সঙ্কট গেছে, কিন্তু পুরভোট না করানোর অজুহাত তখনও আছে। বারবার রব উঠেছিল হোক না পুরভোট। হলো কোথায়? চলে এল ২০২১ বিধানসভা নির্বাচন। তারপর তিন-তিনটে বিধানসভার উপনির্বাচন।

তারপর ২০২২-তে হলো পৌরসভার নির্বাচন। এরপর ২০২৩ আবার পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং দু' একটা বিধানসভার উপনির্বাচন। বাদ পড়ে যেতেও পারে হিসেবে স্মরণে আনতে আরও কোনো নির্বাচন। এই হতে হতেই আসতে চলল ২০২৪-এর লোকসভার আয়োজন। এই চিত্র আমাদের নয়, সব রাজ্যেই কম-বেশি এক। মোটের ওপর কী দাঁড়াল, বছর বছর সব রাজ্যেই এক বা একাধিক নির্বাচন বিশেষ করে বিধানসভা নির্বাচন প্রতি বছরই কোনো না কোনো রাজ্যে লেগেই রয়েছে। তার ওপর রয়েছে দেশজোড়া সাধারণ নির্বাচন প্রতি পাঁচ বছর অন্তর। কিন্তু আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থা যদি আবার ১৯৬৭-র সময়ের মতো হয়। অর্থাৎ সারা দেশে একটি নির্দিষ্ট নির্ধারিত সময়ে একযোগে লোকসভা এবং সংশ্লিষ্ট সব রাজ্যেই বিধানসভা নির্বাচনের আয়োজন হয়। তবে তো সময়, ঝঞ্ঝাট, অর্থ ব্যয়— সর্বপরি নির্বাচন পরিচালনার সঙ্কট অনেক কমে যায়। প্রস্তাব ২০১৪-র সময় থেকেই ধীরস্বরে উঠেছিল ভারতীয় জনতা পার্টি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে। আজ তা সজোরে যুক্তি সরকারে আহ্বান করছে। 'এক দেশ এক ভোট' (One Nation One Election) এই মুহূর্তে অতি গুরুত্বপূর্ণ আবেদন দেশের স্বার্থে এবং মানুষের বৃহত্তর স্বার্থে।

সার্বিকভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর আরও বেশি স্বচ্ছতা আনতে এবং নির্বাচন কমিশনের একসময় যোগে কাজ করার জন্য যদি যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত কোনো পদ্ধতি থাকে তা অবশ্যই একদেশ এক ভোট। এই প্রস্তাবের গুরুত্বে ইতিমধ্যেই দেশের ৪৭টি আলোচিত রাজনৈতিক দলের মধ্যে ৩২টি দল সমর্থন প্রয়োগ করেছে। এই ভোট সংস্কার প্রক্রিয়ার প্রধান উদ্দেশ্য Nation's Growth! ভোট-ভোট করে সময় নষ্ট না করে প্রশাসনিক কাজে অধিক সময় দিক সরকার। একযোগে হোক--- লোকসভা, বিধানসভা ও সিভিক বডির ভোট। গত বছর সেপ্টেম্বরেই মোদী সরকার একটি হাই লেভেল কমিটি গঠন করেছিল এই মর্মে। এই বছর ১৮ সেপ্টেম্বর মোদী সরকারের নতুন ক্যাবিনেট ওই কমিটির প্রস্তাব গ্রহণ করল। যা দেশব্যাপী নির্বাচন দু-স্তরে করার কথা উল্লেখ করছে। প্রথম স্তরে লোকসভা ও রাজ্য ভিত্তিক বিধানসভা একযোগে। এবং দ্বিতীয় স্তরে পরবর্তী ১০০ দিনের মধ্যে হবে দেশব্যাপী লোকাল বডি ইলেকশন। ২০১৭-তে প্রধানমন্ত্রী এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত করতে গিয়ে পারেননি; বিরোধীদের কথা যে গুরুত্ব রাখে। বহু ক্ষেত্রেই হোক তা কম যুক্তির কিন্তু তা লোকতন্ত্রের সম্পদ।

দেশে কি আগে একযোগে নির্বাচন হয়নি? হয়েছিল। ইতিহাস ফিরে দেখি।

১৯৬৭-এর লোকসভা এবং দেশজোড়া সব রাজ্যের বিধানসভা এক সঙ্গেই হয়েছিল। সেদিন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হয়নি, হয়েছিল তৎকালীন কংগ্রেসকে নিয়ে। দলের অভ্যন্তরেই বিশৃঙ্খলা এবং বিরোধী দল ভেঙেই তৈরি হচ্ছিল আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল। উদাহরণে বলা যেতে পারে, উত্তরপ্রদেশের চৌধুরী চরণ সিংহের কথা। যিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে কংগ্রেস ত্যাগ করে গঠন করলেন সংযুক্ত বিধায়ক দল। ফলে পাঁচ বছরের ইউনিফর্ম সিস্টেম গেল ভেঙে। ১৯৭২-এর লোকসভা এবং ইন্দিরার গরিবি হটাও স্লোগান। লাভের মধ্যে যেটা দেখল ভারতের ভোটার, একাধিক রাজ্যে ধারা ৩৫৬ জারি এবং রাজ্য সরকার ভেঙে দেওয়ার অপকৌশল। ফলে পুনরায় ইউনিফর্ম প্যাটার্ন ভেঙে যায়। তারপর বিভিন্ন প্রদেশেও একাধিক আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল বিচ্ছিন্ন কংগ্রেসের থেকে জন্ম নেয় এবং তারা কেউই কংগ্রেসের কথায় লোকসভা বিধানসভা ভোট একযোগে করতে রাজি থাকেনি। ক্রমশ রাজনৈতিক দল সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে চলল। বৃদ্ধি পেতে থাকল নির্বাচনী ঢাকের আওয়াজ। মানুষের প্রচার প্রক্রিয়াও হিড়িক দেখাতে থাকল। প্রচারে মন বেশি চলে গেল, কিন্তু অনেক সময়ই লক্ষ্য করা গেছে সরকার পরিচালনায় সেই হিড়িক কোথায়!

এখন যে বিলটি এল, এক দেশ এক ভোটের তা বহু আলোচনা পর্যালোচনার পর বেশ কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত কমিটি। প্রথম, আর্টিকেল ৮২এ-তে উপধারা ১ যোগ হবে। যা 'appointed Data' সম্পর্কিত। যা পুনরায় উপধারা ২-এর সংযোগ প্রার্থনা করছে। যা উল্লেখ করবে দেশব্যাপী লোকসভা ও বিধানসভার মেয়াদ একযোগেই শেষ হবে। এছাড়াও সংশোধিত হবে আর্টিকেল ৮৩ (২)-নতুন উপধারা ৩ ও ৪ তাতে সংযোগ সংক্রান্ত গঠনে বিধানসভার ক্ষেত্রে আর্টিকেল ৩২৭এ 'Simultaneous elections' শব্দের সংযোগ হবে। এই দ্বিতীয় Constitutional Ammendment Bill-টি অন্তত পক্ষে ৫০ শতাংশ বিধানসভার সমর্থন দাবি করে। এই প্রস্তাবে নির্বাচন কমিশন প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, লোকসভা, রাজ্যসভা, বিধানসভা ও রাজ্য বিধান পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা করবে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন করবে লোকাল বডি ভোট (মিউনিসিপ্যালিটি, পঞ্চায়েত)। এই মর্মে বিলটিতে আর্টিকেল ৩২৪এ-এর সংযোজন হবে লোকাল বডি ভোট একযোগে সম্পন্ন করার কথা। প্রস্তাবিত তৃতীয় বিলটি আপাত সাদামাটা। যেখানে ইউনিয়ন টেরিটরির নির্বাচনও দেশব্যাপী লোকসভা ও বিধানসভার সঙ্গে একযোগে করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এই প্রস্তাবের জোরে Government of National Capital Territory Act 1991, The Government of Union Territones Act 1963 and The Jammu and Kashmir Reorganisation Act 2019-কে অ্যামেন্ড করতে হবে।

Populism কী? এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনার অবকাশ রয়েছে। তবে একথা শোনা যায় 'Populism is an enemy of development'— তাই ঘন ঘন ভোট আনাগোনা মানে এক কথায় তা প্রকৃত উন্নতি ও উন্নয়নের পরিপন্থী। এক দেশ এক নির্বাচনের প্রথম সুফল যে অর্থ ব্যয়ে রাশ টানা— তা বুঝতে কোনো দ্বিমত থাকার কথা নয়। যদি ২০১৪-এর সাধারণ নির্বাচনের দিকেই তাকাই, ব্যয় ছিল ৩,৮৭০ কোটি টাকা! তার ঠিক পরের বছরই বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ব্যয় ছিল আনুমানিক ৩০০ কোটি! যদি নির্বাচন একযোগে হয় তবে প্রতি বিধানসভা নির্বাচনের যে অতিরিক্ত ব্যয় তা সঙ্কোচন সম্ভব। একবাক্যে তা কি উন্নয়ন নয়? একযোগে নির্বাচন সম্পন্ন হলে প্রশাসনিক সময় অনেক বাঁচবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নীতি ও কর্মসূচি প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে। কারণ যত বেশিবার ভোট হাওয়া খেলে ততবারই আদর্শ আচরণ বিধি জারি হয়। যা নতুন প্রকল্প ও সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্তরায়। ২০১৪-র নির্বাচনী সংকল্পপত্রে ভারতীয় জনতা পার্টি এক দেশ এক নির্বাচনের উল্লেখ করেছিল। ২০১৫-র পর থেকে বিভিন্ন সময়ে তা খতিয়ে দেখেছে পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি, আইন

কমিশন এবং নীতি আয়োগ। আইন কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে ইতিবাচক রিপোর্ট জমা দিয়েছিলেন প্রাক্তন বিচারপতি বিএস চৌহান। প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরাও এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে ছিলেন। ২০২২-এ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার চন্দ্রও জানিয়েছেন একই সময়ে সারা দেশের ভোট করার সমর্থক তাঁরা। নিঃসন্দেহে এই কাজ কখনওই যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর পরিপন্থী হবে না।

বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে দীর্ঘ সময়ব্যাপী বিস্তারিত চর্চা হয়েছে। সবচেয়ে বড়ো কথা আইন কমিশনের দাবি, একসঙ্গে নির্বাচন সংঘটিত হলে মানুষের ভোট দানের প্রবণতা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পাবে। এবারেই যে প্রথম প্রস্তাব তা নয়। ১৯৮৩ সালেই জাতীয় নির্বাচন কমিশন সকল নির্বাচন একযোগে সম্পন্ন করার প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু তা গ্রহণ করেনি কেন্দ্র সরকার। ১৯৯-এর আইন কমিশনের রিপোর্টেও কিন্তু একযোগে নির্বাচনের ওপর জোর দেওয়া হয়। তাই হঠাৎ করে মোদী সরকার এসেই এই মারপ্যাঁচ করছে এমন বলাটাও যুক্তিতে পোক্ত হবে না। মোদী সরকার এই ব্যবস্থার জন্য সদর্থক ভূমিকা খাতায়-কলমে নিচ্ছে যা আগে কেউ করেনি। এই প্রস্তাব যে সারমর্মযুক্ত, জনবিরোধী বা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো বিরোধী নয় তা নিশ্চিত। তাই এইমর্মে একাধিকবার হাওয়া উঠেছিল এবার তাতে পাল যোগ হলো।

একাধিকবার কেন্দ্রীয় সরকার 'এক দেশ এক ভোট'— এই মর্মে আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেও তাতে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, এসপি, ডিএমকে এবং আরও বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল বৈঠকে উপস্থিত থাকেনি। ২০১৮ সালে আইন কমিশন এই বিষয়ে দু'দিন ব্যাপী আলোচনা ডাকলে— শিরোমণি অকালি দল, এআইএ ডিএমকে, সমাজবাদী পার্টি, তেলেঙ্গানা (বর্তমানে ভারত) রাষ্ট্র সমিতি এই প্রস্তাবে সমর্থন দেয়। কিন্তু গোয়া ফরওয়ার্ড পার্টি (তখন বিজেপির দোসর দল যদিও) থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম, সিপিআই, ফরওয়ার্ড ব্লক, জনতা দল সেকুলার যুক্তিহীন ভাবে অসমর্থন করে এই প্রস্তাব। একটাই কথা, অসাংবিধানিক, অগণতান্ত্রিক।

এই ধরনের বিরোধিতা কি সত্যিই গ্রাহ্যতার দাবিদার? যোগ্যও কি? বৈঠকের পর বৈঠক যারা অগ্রাহ্য করে অনুপস্থিত থাকে, তারপর প্রস্তাবের বিপক্ষে কী কী যুক্তি তা কিছুতেই স্পষ্ট হয় না। এরপরেও কোন দিব্যবলে বিল পাশের সময় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র তত্ত্ব আবিষ্কার করে? আবিষ্কার করে, যা কিছুই সংস্কার চলছে সবটাই অগণতান্ত্রিক এবং সংবিধানবিরোধী। প্রসঙ্গত, সংবিধানতো আর বেদ নয়। এর আগেও দেশের স্বার্থে এমনকী কংগ্রেস আমলে একাধিকবার রাজনৈতিক স্বার্থে সংখ্যালঘু তোষণের স্বার্থে পর্যন্ত নানান আর্টিকেল পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত, পরিবর্তিত করা হয়েছিল। তাই সংবিধানে হোঁচট খাবে এই বিল--- এই ভাবনায় যেসব দল হা-হুতাশ করছিল, নিশ্চয়ই তারা অনুচ্ছেদগুলির পরিবর্তিত রূপে সন্তুষ্ট। ২০২২-এর ডিসেম্বরেও আইন কমিশন দেশের রাজনৈতিক দল, ভারতের নির্বাচন কমিশন, আমলা, শিক্ষাবিদ-সহ বিশেষজ্ঞমহলের মতামত চেয়েছিল। তাই শিবসেনার প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী কিংবা কংগ্রেসের মল্লিকার্জুন খাড়গে যখন বলেন আলোচনা ছাড়াই সব বিল পাশে করার তালে থাকে কেন্দ্র— তা ডাঁহা মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। আসল কথা, বিরোধীদের গাত্রদাহ অন্য কারণে। তাদের আশঙ্কা, এক দেশ এক ভোট হলেই বোধহয়

> **এক দেশ এক ভোট— কখনওই নির্বাচন এর রাজনৈতিক হইচই নয় মঞ্চ মুখরতা নয়। এ অত্যন্ত সূক্ষ্ম অভিজ্ঞ যুক্তিগ্রাহ্য সমীকরণ, সমীক্ষা, হিসেব, পরিকল্পনা এবং ভবিষ্যৎ ভাবনা নির্বাচন ঘণ্টার ঢং ঢং-এর সঙ্গে এক দেশ এক ভোটের প্রস্তাব ওজন একাকার করা যাবে না।**

ফ : ৪

কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক দল অধিক জনসমর্থন পাবে, কারণ কেন্দ্রমুখী টানে অধিক ভোট আকর্ষণের সম্ভাবনা থাকছেই। কেন্দ্র ও রাজ্য ভোট একযোগে হলে পাছে কেন্দ্রমুখী ফোকাস ভোটারের অধিক থাকে এবং সেই প্রভাব যদি রাজ্য বিধানসভাতেও আসে! এই কাপালকল্পিত সঙ্কটে ভুগছে আঞ্চলিক দলগুলি। তা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। তাদের উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রবল মোদী হাওয়াতেও বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস জয় পেয়েছে। বিধায়ক নির্বাচনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক দলের প্রতি যদি জনসমর্থন থাকে তাতে বিন্দুমাত্র ঋণাত্মক প্রভাব ফেলবে না এক দেশ এক ভোট প্রক্রিয়া। হ্যাঁ, একটা অসুবিধা হলেও হতে পারে; কিছু আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল এখনও ঘুরপথে ভেট দেওয়া, অর্থ বিলি ইত্যাদির মাধ্যমে ভোটার প্রভাবিত করে। এক দেশ এক ভোটে সেই বদভ্যাসে ভাঁটা আসবে বেশ জোরেই। লোকতন্ত্র এক অদ্ভুত সংখ্যাতত্ত্বের ম্যাজিক। এখানে সমীক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধোপে টেকে না। একটা অদৃশ্য কারণের জন্যও নির্বাচনের ফল প্রত্যাশার আকাশ পাতাল ফারাক ঘটে। যেমন ঘটল ২০২৪ লোকসভায়। ভারতীয় জনতা পার্টির হাওয়া দেশব্যাপী থাকা সত্ত্বেও তা সার্বিকভাবে আশানুরূপ ফল পায়নি। আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের দৌরাত্ম্য বেশ কিছু রাজ্যে স্পষ্ট। এই ফলাফলের পর, যারা গোঁয়ার যুক্তিতে এক দেশ এক ভোটের বিরোধিতা করছিলেন তারা নিশ্চয়ই এবার মতো বদলাবেন। মোদী ম্যাজিক যে সব রাজ্যে লোকসভার ক্ষেত্রেই ঠিকঠাক খাটল না; তা পরিষ্কার। তবে? তবেতো প্রমাণিত বা অন্তত হাইপোথিসিস এটাই যদি ২০২৪ লোকসভার সময় পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা একযোগে হতো তবে তৃণমূল সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেত। নীতীশ কুমার বেশ ভালো ফল করতেন। অর্থাৎ লোকসভায় মোদী ম্যাজিকে যে সব আঞ্চলিক দল মাথা উঁচু করে আসন সংখ্যা দেখাল তারা একযোগে বিধানসভা হলে নিশ্চয়ই মন্দ সংখ্যা পেত না। প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার কৌরেশি এক দেশ এক ভোটের পক্ষে থেকেও সেনা যোগ/প্রয়োগ সম্বন্ধে বলেছেন— "Unless there is the deployment of an adequate number of paramilitary forces, even simultaneous elections will have to be carried out over a period of 2-3 months which will defeat the purpose. Currently, an election sees deployment of about 800 company forces. The Government will have to provide at least 3000-3500 companies to ensure that the election is conducted within 30 days at least." তাঁর মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং সেনা নিয়োগ-সহ অন্যান্য লজিসটিক্স-এর বিষয়ে নির্বাচন কমিশন যদি সবুজ সঙ্কেত দেন তবে এক দেশ এক ভোট কেবলমাত্র রাজনৈতিক তরজা কাটিয়ে শুরু হওয়ার অপেক্ষা মাত্র। আমেরিকার নির্বাচনে বলা হয় 'Coat tail effects'— যার মানে কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নায়ক চরিত্র বা নিউক্লিয়াস নিজের পক্ষে ভোট আকর্ষণ করতে পারেন। পরোক্ষভাবে ভোটার প্রভাবিত করা বললেও অত্যুক্তি হবে না। ২০২৩-এ ইকনমিক্স টাইম ব্যুরো উল্লেখ করছে ভারতে নির্বাচনের এই নব প্রক্রিকায় হবে--- 'Kurta tail effect'। বিরোধীদের মুখপত্র হিসেবে অভিভূত বিভিন্ন পক্রিয়ায় এই জাতীয় শব্দাবলী ধ্বনিত হলেও ভারতে নির্বাচনের ইতিহাস এবং অনবদ্যতার খোঁজ করলেই বোঝা যাবে এক যোগে নির্বাচন মানেই তা কারোর পক্ষেই হাওয়া বয় না। তবে কেন ঘটল ১৯৬৭-র ফল? তখনতো সর্বত্র কংগ্রেস আর কংগ্রেস। একযোগে দুই নির্বাচন। তাও কী ঘটল? ১৮টি রাজ্যে যখন সমান্তরাল একযোগে নির্বাচন হলো তখন কংগ্রেসতো চারটি রাজ্যে লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হতেই পারল না।

কংগ্রেসের আমলে রাজ্য দখলের প্রধান অস্ত্র ছিল যে কোনো অছিলায় ৩৫৬ প্রয়োগ এবং নির্বাচিত রাজ্য সরকারকে ফেলে দেওয়া। তাই সমান্তরাল নির্বাচন বেশ কয়েকবার করলেও (প্রস্তাবনা ছাড়াই) তারাই রাষ্ট্রপতি শাসনে রাজ্য সরকার ফেলে দিয়ে নির্বাচন প্রক্রিয়ার পাঁচ বছরের চক্র বার বার বিঘ্ন করেছে। তাই ওইসব কংগ্রেসি বছরের উদাহরণ দিয়ে কেউ যেন না বলেন— এক যোগে নির্বাচন হয় না। এক দেশ এক ভোটের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে নিশ্চিত করতে হবে একযোগে ভোট করার জন্য পর্যাপ্ত লজিসটিক্স, যেমন ইনলেকশন ভোটিং মেশিন, ভোটার ভেরিফিকেশন স্লিপ, কেন্দ্রীয় বাহিনী, নজরবন্দি ক্যামেরা ইত্যাদি সব কিছুর পর্যাপ্ত যোগান থাকবে কিনা। এই বিষয়ে এখনও প্রশ্ন তুলছেন প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এসওয়াই কুরেসি। তাঁর কথা বিরোধীদের মতো খানিক শোনালেও, যেহেতু কমিশনার হিসেবে তাঁর মতামত ও অভিজ্ঞতা মূল্য ধরে, তাই মতামতের যুক্তি অবশ্যই বিবেচ্য। তিনি লজিসটিক্স নিয়ে তীব্র প্রশ্ন ক'দিন আগেও তুলছেন।

"Conducting separate elections just months apart will create significant logistical challenges and voter fatigue', যদি একযোগে নির্বাচন হয়, তবে তাঁর হিসেব বলছে ৪০ লক্ষ অতিরিক্ত মেশিন দরকার। এবং এও বলছেন, 'And one thing which is in favour of simultaneous elections is that for all three tires, the voters is the same, the polling booth is the same, the people who conduct the election are same. Now the Election Commisson has flagged a logistical problem that they will requite three times number of EVMs and the VVPATs. So just calculate, thousands of crores of rupees will be required...' এই বিষয়গুলি অত্যন্ত বাস্তব সমস্যা এবং তা নিশ্চয়ই কমিশন গোচরে রেখেছেন। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও আশাকরি আছে। এক দেশ এক ভোট— কখনওই নির্বাচন এর রাজনৈতিক হইচই নয় মঞ্চ মুখরতা নয়। এ অত্যন্ত সূক্ষ্ম অভিজ্ঞ যুক্তিগ্রাহ্য সমীকরণ, সমীক্ষা, হিসেব, পরিকল্পনা এবং ভবিষ্যৎ ভাবনা নির্বাচন ঘণ্টার ঢং ঢং-এর সঙ্গে এক দেশ এক ভোটের প্রস্তাব ওজন একাকার করা যাবে না।

আজকে উদ্দেশ্য একটাই, ভোট ভোট করে সময়, অর্থ এবং অহেতুক লোকবল ব্যয় না করে তাকে দেশ এবং প্রশাসনিক কল্যাণে ব্যবহার করা। রাজনীতি নিয়ে মানুষের মনে অনেক দ্বিধা ও সমালোচনা তৈরি হচ্ছে। সেই দ্বন্দ্ব মেটাতে পারে একমাত্র সুপ্রশাসন ও রাজধর্ম। এক দেশ এক নির্বাচন নিয়ে এই বছর মার্চে পূর্বতন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বাধীন কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেছিল তাতে সবুজ সংকেত পড়ল। প্রধানমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে মন্ত্রীসভার বৈঠক হয়েছে। এখনও চলছে বিরোধিতা। বিগত কয়েক বছর ভারতীয় রাজনীতির যা ছবি, তাতে মনে হয়েছে যে, সকল বিলেই বিরোধিতার তীব্রতা নিশ্চিত, তাদের অধিকাংশই রাষ্ট্রপরিপন্থী। তাই এই বিল Good Governance-এর অংশ ধরাই যায়। বিলটি সম্পন্ন হওয়ার দিকে আরও এগোবে। নিন্দুক রাজনৈতিক দল স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যে যতবার অসাংবিধানিক বলবে ততবার প্রতিষ্ঠিত হবে এই প্রস্তাব কেবলমাত্রই সংবিধানমুখী নয়, তা জনমুখী ও প্রশাসনমুখী। বিরোধিতা হোক কিন্তু তা যেন তত্ত্ব প্রণয়নের ভাণ্ডার রাখে। নতুবা বিল পাশ হবে, বিরোধিতা ফেল করতেই থাকবে। ■

# নির্বাচনী ডাকটিকিট

সৈকত চট্টোপাধ্যায়

স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতীয় ডাকবিভাগ গণতান্ত্রিক নির্বাচনী কাজে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছে। 'ফিলাটেলি' বা ডাকটিকিট- সংগ্রহ ও চর্চা হচ্ছে ডাকবিভাগ সংক্রান্ত বৃহত্তর কার্যাবলী এবং সামগ্রী, যা সাধারণ মানুষ ভালোবেসে সেই সম্পর্কিত বিস্তারিত খোঁজখবর নেন ও তথ্য অনুসন্ধান করেন। ডাক-সামগ্রীর নমুনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও আদানপ্রদান করে একটি উচ্চস্তরের শখ পূরণ করেন। এর মধ্যে রয়েছে স্মারক (Commemorative stamps) ও নিয়মিত ডাকটিকিট সংগ্রহ (Definitive stamps), পোস্টাল খাম (First day and special cover), পোস্টকার্ড (সাধারণ ও মেঘদূত), অন্তর্দেশীয় পত্র (Inland letter), পোস্টাল তথ্য বা ব্রোশিয়োর, ফিলাটেলিক ম্যাগাজিন, ডাক-বিজ্ঞাপনের অনুসন্ধান ও সংগ্রহ ইত্যাদি।

ভারত হলো এই বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। নির্বাচনী সচেতনতা তৈরিতে এইসব ফিলাটেলিক আইটেম বা ডাকটিকিট সামগ্রীর ভূমিকা একসময় গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পোস্টাল ব্যালট প্রেরণ, গ্রহণ এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তা পুনঃপ্রেরণ—আজও সেই ধারার অনুষঙ্গেই চলছে। একদা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থী নির্বাচকদের সঙ্গে জনসংযোগ বজায় রেখেছিল ডাকবিভাগের মাধ্যমেই। দূরবর্তী স্থানে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রেরণ করেছে ডাকবিভাগের সহায়তায়। ভারতীয় ডাকবিভাগ তাই দেশের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের এক অন্যতম প্রতীক-প্রতিষ্ঠান হয়ে রয়েছে।

১৯৬২ সালে ভারতীয় ডাকবিভাগ 'পঞ্চায়েতিরাজ' বিষয়ের উপর ১৫ নয়াপয়সা মূল্যের ৫০ লক্ষ স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে। এই টিকিটের মধ্যে বটবৃক্ষের তলায় অনুষ্ঠিত পঞ্চায়েত বৈঠকের ছবি, তার প্রেক্ষাপটে আইনসভা গৃহ এবং ভারতের মানচিত্র। মূলত পঞ্চায়েত নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি নির্বাচকদের আগ্রহ জন্মানোর জন্যই এই উদ্যোগ।

১৯৬৭ সালে ১৫ নয়াপয়সা মূল্যের আর একটি ডাকটিকিট মুদ্রিত হয়, যার বিষয় ছিল— 'Indian General Election'। সেখানে দেখানো হয়েছে একটি পোলিং বুথের ছবি, তাতে অপেক্ষমান নির্বাচকবৃন্দের সারি, আর ইনবক্সে রয়েছে একজন মহিলা নির্বাচক ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন। এই ডাকটিকিটটি সেই সময় ভারতীয়দের বিশেষ করে মহিলাদের মনে ভোটদান সম্পর্কে একটি সদর্থক বার্তা পৌঁছে দিয়েছে।

২০১০ সালে ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষে বার্তা দিয়ে যে ডাকটিকিটটি প্রকাশিত হয়, তখন ভারতীয় নির্বাচনী ব্যবস্থায় চলে এসেছে ইভিএম মেশিন এবং সচিত্র ভোটার কার্ড। এই দু'টি বৈশিষ্ট্যই এখানে তুলে ধরা হয়েছে এবং মহিলা সমাজের কাছে বিশেষ বার্তা দিতে দেখানো হয়েছে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য অপেক্ষমান মহিলাদের সারি। ডাকটিকিটটির মূল্যমান ছিল পাঁচ টাকা। ২০২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি যে ডাকটিকিটটি প্রকাশিত হয়, তার মূল বিষয়--- 'Inclusive Election– Election Commission of India', মূল্যমান পাঁচ টাকা।

এই স্ট্যাম্পগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই ডাকটিকিটগুলির জন্য আলাদাভাবে তথ্য-সংবলিত ব্রোশিয়োর বা তথ্য-ফোল্ডার ছাপা হয়েছিল। এছাড়াও ছাপা হয় নির্বাচন সংক্রান্ত ফার্স্ট-ডে কভার বা প্রথমদিনের জন্য সেই ডাকটিকিট ব্যবহার করার রঙচঙে খাম। নির্বাচন সংক্রান্ত বিশেষ খাম বা স্পেশাল কভারও ছাপা হয়েছে কোনো কোনো সময়ে। কোনো রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে ফিলাটেলিক আইটেমও ছাপা হতে দেখা গিয়েছে, যেমন— ২০১৯ সালের মহারাষ্ট্র বিধানসভার ভোট। গরীব মানুষের মধ্যে নির্বাচনী সচেতনতা এবং নির্বাচনে তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ছাপা হয় বিশেষ নির্বাচনী 'মেঘদূত' পোস্টকার্ড।

এই সমস্ত নিয়ে ভারতের নির্বাচনী বার্তা ভারতীয় জনমানসে ডাকবিভাগের মাধ্যমে প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে। ■

# রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান ফ্রিডম মুভমেন্টের উদ্যোগে বিজয়া সম্মেলন

গত ২৯ অক্টোবর, কলকাতা-স্থিত ভারতসভা হলে 'রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান ফ্রিডম মুভমেন্ট'-এর উদ্যোগে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবারসমূহের যোগদানে অনুষ্ঠিত হলো বিজয়া সম্মেলন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরগতিপ্রাপ্ত বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী, মাস্টারদা সূর্য সেন, বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ-সহ বহু বরেণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীর পরিবারের সদস্যরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিঠু চক্রবর্তী, প্রসাদরঞ্জন দাশ, মাস্টারদা সূর্য সেনের নাতনি মিতা মিত্র, শিক্ষাবিদ সায়ন্তন বসু প্রমুখ।

সার্ধ-শতবর্ষ প্রাচীন ভারতসভায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথিদের মধ্যে ছিলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রপৌত্রী, স্বনামধন্যা গায়িকা নূপুর কাজী। তাঁর কণ্ঠে পরিবেশিত 'কারার ওই লৌহকপাট' গানটির মাধ্যমে মন্দ্রিত হয় সভাগৃহ। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহযোগী ১০৫ বছর বয়সী স্বাধীনতা সংগ্রামী হরেন বাগচী প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। 'রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান ফ্রিডম মুভমেন্ট'-এর প্রতিষ্ঠাতা বিচারক বিপ্লব রায় তাঁর মূল্যবান বক্তব্যে বর্তমান সময়ের আঙ্গিকে সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সত্যাসত্য নিরূপণ, তার পুনর্মূল্যায়ন এবং ইতিহাসের পাতা হতে হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন বিপ্লবীদের নাম তথ্যভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরে তাঁদের ঐতিহাসিক অবদানের স্বীকৃতিদান সংক্রান্ত সাংগঠনিক কর্মসূচির বিষয়ে তিনি বক্তব্য রাখেন। সংগঠনের সভাপতি, বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর প্রপৌত্র সুব্রত চাকীর বক্তব্যে উঠে আসে তাঁর পূর্বজ প্রফুল্ল চাকী-সম্পর্কিত অনেক অজানা ইতিহাস। সংগঠনের সম্পাদক, আই.এন.এ-র সেনানী লেফটেন্যান্ট সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের ভ্রাতুষ্পৌত্র কৌশিক দত্তগুপ্ত জানান যে বর্তমান পাঠ্যপুস্তকগুলিতে গ্রন্থিত ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বহুলভাবে রাজনৈতিক পক্ষপাত-আক্রান্ত। এতে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সত্যের অপলাপ হয়েছে, কোথাও বা প্রকৃত ইতিহাসকে ইচ্ছাকৃতভাবে ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষিত, দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে সবার কর্তব্য হলো রাজনৈতিক পক্ষপাতহীনতা এবং তথ্যনির্ভর সত্যের ভিত্তিতে ভারতীয় ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ন। এটিই এই সংগঠন গড়ে ওঠার মূল উদ্দেশ্য।

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা বিপ্লব রায় বলেন— 'স্বাধীনতা সংগ্রামে হাজার হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামী জীবন দিয়েছিলেন, কিন্তু সেভাবে তাঁদের ইতিহাস লেখা হয়নি। তাই আমরা ঠিক করেছি, এক বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ১০০ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীর মূর্তি বসাব। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে আমরা অনুরোধ জানাবো--- দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ছবি বিভিন্ন মুদ্রায় যাতে প্রকাশ পায়'। তিনি উল্লেখ করেন, দার্জিলিঙে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্মৃতিবিজড়িত একটি বাড়ি রয়েছে। সেখানে তাঁর ব্যবহৃত বহু সামগ্রী রয়েছে। এই বাড়িটি বর্তমানে রাজ্যপালের অধীনে। দার্জিলিঙে দেশ-বিদেশের পর্যটক আসেন। তাঁদের জন্য এই বাড়িটি খুলে দেওয়া হোক। সেখানে তৈরি করা হোক একটি সংগ্রহশালা। অনুষ্ঠানে বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী, দীনেশ গুপ্ত-সহ বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীর পরিবারের সদস্যরা নানান স্মৃতিচারণ করেন। একদা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গী ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী হরেন বাগচী। সেই স্মৃতিকথা তিনি সকলকে শোনান। বিজয়া সম্মেলনে উপস্থিত সংগঠনের কার্যকর্তারা বলেন যে অখণ্ড বঙ্গের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস নিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে পূর্ববঙ্গ (অধুনা বাংলাদেশ) ও পশ্চিমবঙ্গে উন্নতমানের গবেষণার অভাব রয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই অধ্যায় নিয়ে আরও বেশি চর্চা হওয়া দরকার। এই ইতিহাস-সমৃদ্ধ বইপত্র রচনা করতে হবে, যেখানে গবেষকরা পাবেন প্রয়োজনীয় নানা প্রামাণ্য তথ্য। এমনভাবে সেগুলি গ্রন্থিত হতে হবে যাতে নতুন প্রজন্ম সেগুলি পড়ে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্তারিত ইতিহাস জানতে পারেন।

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

# বঙ্গদেশে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজার আখ্যান

**গোপাল চক্রবর্তী**

দেবী দুর্গার বিভিন্ন রূপের মধ্যে জগদ্ধাত্রী রূপ অন্যতমা। মহিষাসুর মর্দিনীর মতো করীন্দ্রাসুরনিসূদিনী রূপে দেবী জগদ্ধাত্রী পূজিতা হন। 'মায়াতন্ত্রে' (দ্বিতীয় ও চতুর্থ পটল) ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ-এর 'তন্ত্রসারে' দুর্গা প্রসঙ্গে জগদ্ধাত্রীর কথা বলা হয়েছে। কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীর বিশেষ পূজার বিধান পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর বৃহস্পতি রায়মুকুটের 'স্মৃতিরত্নহার' ও শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণির 'কৃত্যতত্ত্বার্ণব' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।

পূজার ধ্যান-অনুসারে দেবী সিংহস্কন্ধে সমাসীনা, নানালংকার ভূষিতা, চতুর্ভুজা, রক্তবস্ত্র পরিহিতা। দেবীর গাত্রবর্ণ উদীয়মান সূর্যের মতো। সর্প জগদ্ধাত্রীর যজ্ঞোপবীত। চতুর্ভুজা দেবীর বামহস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও ধনুক, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে চক্র ও পঞ্চবাণ। কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্তরূপে ধ্যানটি 'তন্ত্রসারে' পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী দেবীর পূজার প্রচলন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। অষ্টাদশ শতক, বঙ্গদেশে তখন নবাবী শাসন, বঙ্গের মসনদে তখন আলিবর্দি খান। তৎকালীন শাসক সরফরাজ খানকে পরাজিত ও নিহত করে তিনি বঙ্গের মসনদে আসীন হন। মারাঠা সৈনিকদের সঙ্গে সংঘর্ষে ভিত কেঁপে গিয়েছে ইসলামি শাসনের। রাজকোষ শূন্য, সেনারা বিক্ষুব্ধ। এই অবস্থায় আলিবর্দি জমিদারদের উপর বাড়তি করের বোঝা চাপালেন। এক বিশাল পরিমাণ খাজনার ফরমান এলো কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে দাবি দশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। কৃষ্ণনগরের রাজকোষেও অত স্বর্ণমুদ্রা নেই। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে খাজনা দিতে না পারায় নবাবীফৌজ কয়েদ করল মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে। আশ্বিন মাস দুর্গাপূজা সমাগত, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দি নবাবের কারাগারে। রাজবাটীর দুর্গা মণ্ডপে এবছর আর আলো জ্বললো না। রানি অনেক চেষ্টায় জগৎশেঠের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে খাজনা পাঠালেন মুর্শিদাবাদে। দশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা হাতে পেয়ে আলিবর্দি কৃষ্ণচন্দ্রকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়ার আদেশ দিলেন।

মুক্ত হয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে বজরায় কৃষ্ণনগরে ফিরছেন কৃষ্ণচন্দ্র। সেদিন বিজয়া দশমী। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জন হচ্ছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মন ভারাক্রান্ত, এবারে তিনি মায়ের পূজায় ব্রতী হতে পারেননি। অশ্রুসিক্ত নয়নে বারবার বলছেন কেন তাকে এবার মা জগজ্জননী তাঁর সেবা থেকে বঞ্চিত করলেন। ক্রমে রাত্রি সমাগত হলো, রাজাও তন্দ্রাভিভূত হলেন। রাজা স্বপ্নে দেখলেন স্বয়ং মহামায়া এসে তাঁকে বলছেন, রাজার ক্ষোভের কোনো কারণ নেই। আগামী (একমাস পরে) শুক্লা নবমী তিথিতে একদিনে তিনবার তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের পূজা গ্রহণ করবেন। রাজার ঘুম ভেঙে গেল, পরদিন সকালে রাজা পৌঁছে গেলেন কৃষ্ণনগরের রাজপ্রাসাদে। পরিজন এবং পণ্ডিতদের ডেকে বিবৃত করলেন স্বপ্ন বৃত্তান্ত। পণ্ডিতরা মত দিলেন কার্তিকের শুক্লা নবমীতে মহামায়ার পূজার বিধান আছে। তবে সেই পূজা দেবীর অন্যরূপ জগদ্ধাত্রীর। যথাসময়ে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে পূজিতা হলেন মহামায়া, দেবী জগদ্ধাত্রী রূপে, একদিনে তিনবার। সেই থেকে শুরু শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজার।

কৃষ্ণনগরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জগদ্ধাত্রী পূজার খ্যাতি অল্প দিনের মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৭৫৭-র পলাশীর যুদ্ধের পর বঙ্গদেশে ক্রমে ক্রমে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজরা সনাতনধর্মীয় রীতিনীতির উপর সাধারণত হস্তক্ষেপ করতো না। কৃষ্ণনগরের রাজকীয় জগদ্ধাত্রী পূজার জৌলুস ক্রমশ বাড়তে থাকে। বঙ্গদেশ ইংরেজদের করতলগত হলেও গঙ্গাতীরের চন্দননগর ছিল ফরাসী উপনিবেশ। ফরাসী সরকারের দেওয়ান ছিলেন চন্দননগরের ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। তিনি ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ। জগদ্ধাত্রী পূজায় আমন্ত্রিত হয়ে তিনি এলেন কৃষ্ণনগরে। জগদ্ধাত্রী পূজার আধ্যাত্মিকতা এবং জাঁকজমক দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। পণ্ডিতদের কাছে পূজার রীতি নীতি জ্ঞাত হয়ে তিনি চন্দন নগরে প্রথম জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন করলেন। তাঁর মৃত্যুর পর অবশ্য সেই পূজা সার্বজনীন হয়ে যায়। এবং সার্বজনীন পূজার সংখ্যা ক্রমে বাড়তে থাকে। পরবর্তীকালে কৃষ্ণনগর, চন্দননগর ছাড়িয়ে জগদ্ধাত্রী পূজা বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। একদিনের পরিবর্তে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তিনদিন ব্যাপী পূজার প্রচলনও কোথাও কোথাও হয়েছে।

কোথাও আবার সাবেকী মতে একদিনে (নবমী) পূজাও অনুষ্ঠিত হয়। যতই দিন যাচ্ছে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে জগদ্ধাত্রী পূজার জৌলুস ক্রমশ বেড়ে চলেছে। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজার খ্যাতি বর্তমানে ভারতবর্ষের সীমা ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বেও ছড়িয়ে পড়েছে। এই মহাপূজায় আমাদের সমবেত প্রার্থনা হোক।

ওঁ আধারভূতে চাধেয়ে ধৃতিরূপে ধুরন্ধরে।
ধ্রুবে ধ্রুবপদে ধীরে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে।।
শবাকারে শক্তিরূপে শক্তিস্থে শক্তি বিগ্রহে।
শাক্তাচারপ্রিয়ে দেবি জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে।।

# বউবাজার 'নৃত্য ভবন'-এর ঐতিহ্যমণ্ডিত জগদ্ধাত্রী পূজা

**সপ্তর্ষি ঘোষ**

মধ্য কলকাতার বউবাজার এলাকায় মুচিপাড়া থানার অধীনস্থ ১০ নম্বর বাবুরাম শীল লেনের 'নৃত্য ভবন'-এর (দত্ত পরিবার) জগদ্ধাত্রী পূজা কলকাতার বনেদি বাড়ির জগদ্ধাত্রী পূজাগুলির মধ্যে অন্যতম। দত্ত পরিবারে জগদ্ধাত্রী পূজা কবে শুরু হয়েছিল, সঠিক জানা না গেলেও পূজার বয়স যে সার্ধ শতাধিক বছর অতিক্রান্ত, সেই বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই। কেননা বর্তমান প্রজন্ম পাঁচ পুরুষ ধরে জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীর আরাধনা করে আসছেন।

এই প্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত জগদ্ধাত্রী পূজার ইতিহাস জানতে হাজির হয়েছিলাম দত্ত পরিবারের প্রবীণতম সদস্য ৯৫ বছর বয়সি কাশীনাথ দত্ত মহাশয়ের কাছে। আলাপচারিতায় শ্রীদত্ত জানালেন, দত্ত পরিবারে জগদ্ধাত্রী পূজার সূত্রপাত করেন পরিবারের আদিপুরুষ বলাইচাঁদ দত্ত। প্রথম কয়েক বছর পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৩ নম্বর বাবুরাম শীল লেনের বাড়িতে। বলাইচাঁদ দত্ত-র পরে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নৃত্যলাল দত্ত জগদ্ধাত্রী পূজার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি অদূরে ১০ নম্বর বাবুরাম শীল লেনে তিন খিলানের ঠাকুরদালান-সহ বিশাল অট্টালিকা তৈরি করে পূজা সেখানে স্থানান্তরিত করেন। সেও দেড় শতাধিক বছর আগের কথা। তদবধি ওই বাসভবনে জগদ্ধাত্রী পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নৃত্যলালের নামাঙ্কিত এই বাসভবন (নৃত্য ভবন) তাঁর স্মৃতি বহন করছে। নৃত্যলাল দত্তের উত্তরসুরিরা বর্তমানে জগদ্ধাত্রী পূজার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

জগদ্ধাত্রী পূজার দিন সকাল থেকেই অতিথি-অভ্যাগতদের উপস্থিতিতে 'নৃত্য ভবন' মুখরিত হয়ে ওঠে। দত্ত পরিবারের যে সব সদস্য অন্যত্র বাস করেন, তারাও জগদ্ধাত্রী মাতার অমোঘ আকর্ষণে 'নৃত্য ভবন'-এ উপস্থিত হন। জগদ্ধাত্রী পূজা এদের কাছে পারিবারিক মিলোনৎসবও। এই দিনটির জন্য দত্ত পরিবার সারা বছর সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে।

ডাকের সাজে সজ্জিতা স্বর্ণালংকারে ভূষিতা নয়নাভিরাম মাতৃমূর্তি। মায়ের শান্ত স্নিগ্ধ প্রসন্নময়ী রূপে হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়। দেবী জগদ্ধাত্রী চতুর্ভুজা। চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। ডান পায়ের জানুর উপর বাম পা রেখে বাহন সিংহের উপর উপবিষ্ট। দেবীর বাহন শ্বেতবর্ণের সিংহ। সিংহের পদতলে হস্তিমুণ্ড। দেবীর দুই পাশে দুই সহচরী— জয়া ও বিজয়া।

জগদ্ধাত্রী পূজার প্রাক্ সন্ধ্যায় আমন্ত্রণ ও অধিবাস। পূজার দিন সকালে ৭ নম্বর বাবুরাম শীল লেনস্থ ঠাকুরবাড়ি থেকে নারায়ণ, মা মঙ্গলচণ্ডী ও মা লক্ষ্মী-কে 'নৃত্য ভবন'-এ নিয়ে আসা হয়। এরপর সংকল্প, দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও চক্ষুদান করে পূজার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। পর্যায়ক্রমে সপ্তমী, অষ্টমী, সন্ধিপূজা ও নবমী একই দিনে নিষ্ঠা সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধিপূজায় ১০৮টি প্রদীপ প্রজ্বলনে সমগ্র বাড়িতে এক পবিত্র ও ভাবগম্ভীর আবহ তৈরি হয়, চাক্ষুষ না করলে যা কল্পনা করা যাবে না। মৃন্ময়ী মা যেন তখন চিন্ময়ী রূপে প্রতিভাত হন।

অষ্টমী ও সন্ধিপূজার মধ্যবর্তী সময়ে মহিলারা দু'হাতে দুটো সরা এবং মাথায় একটা মালসা নিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে বসে কাঠ-কয়লার আগুনে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে ধুনো পোড়ান। এটি সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের একটি নিজস্ব রীতি।

বৈষ্ণব মতে পূজা হয়। অন্নভোগের প্রথা নেই। সংকল্প হয় পালাদারের নামে। পূজার ব্যয় নির্বাহ হয় 'জগদ্ধাত্রী মাতা'র নির্দিষ্ট বাড়ি ভাড়া বাবদ সংগৃহীত আয় থেকে।

পরদিন সকালে দশমী পূজা শেষে দর্পণে মায়ের চরণ দর্শনের পালা। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে মায়ের বিদায় মুহূর্ত। সকলের মন তখন ভারাক্রান্ত। বিকেলে বেদী থেকে মা-কে উঠোনে নামানোর পরে মহিলারা বরণ করেন ও সিন্দুর খেলায় মেতে ওঠেন। সবশেষে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য কাশীনাথ দত্ত মা জগদ্ধাত্রীর পা ধুইয়ে দেন এবং মা-কে কানে কানে আগামী বছর আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। উল্লেখ্য, সেই সময় অন্য কেউ উপস্থিত থাকেন না। এরপর কণকাঞ্জলি দিয়ে মা জগদ্ধাত্রী-কে বিদায় জানানো হয়। সকলের কণ্ঠে তখন একটাই প্রার্থনা— 'আবার এসো মা'।

পারিবারিক রীতি অনুযায়ী, বাবুঘাটে জগদ্ধাত্রী প্রতিমা নিরঞ্জন হয়। আগে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হতো নৌকায় করে মাঝ গঙ্গায় গিয়ে। বর্তমানে প্রশাসনিক অনুমতি না মেলায় বিসর্জনের ওই রীতি অনুসৃত হয় না। ফিরে এসে শান্তিজল গ্রহণের মধ্য দিয়ে জগদ্ধাত্রী পূজা সম্পন্ন হয়। আবার এক বছরের প্রতীক্ষা।

*(এই প্রতিবেদককে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন দত্ত পরিবারের সদস্য অসিত দত্ত।)*

# মা সারদার জগদ্ধাত্রী পূজা

মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কল্যাণ চক্রবর্তী

**১. প্রাক্-কথন :**

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন (২২ জুলাই, ১৮৮৩) মাস্টারমশাই (শ্রীম)-কে বলেছেন, 'জগদ্ধাত্রীরূপের মানে জানো? যিনি জগৎকে ধারণ করে আছেন। তিনি না ধরলে, তিনি না পালন করলে জগৎ পড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। মনকরীকে যে বশ করতে পারে, তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হন।' পাশে রাখালও ছিলেন, তিনি কথার সূত্র ধরে বললেন, 'মন-মত্ত-করী!' শ্রীরামকৃষ্ণ এবার বললেন, 'সিংহবাহিনীর সিংহ তাই হাতিকে জব্দ করে রয়েছে।'

কথামৃত থেকে জানা যায়, ১৮৮২ সালের ১৯ নভেম্বর, রবিবার শ্রীরামকৃষ্ণ জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষ্যে ঠাকুরের গৃহীভক্ত ও রসদদার সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের (১৮৫০-১৮৯০) নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তাঁর সিমুলিয়ার বাড়ি গিয়েছিলেন। মাস্টারমশাইও গিয়েছিলেন। সুরেনের মেজোভাই ছিলেন জজ। তাঁকে সেদিন যা বললেন তা তাৎপর্যপূর্ণ, 'লোকে মনে করে আমরা বড়লোক; ছাদের জল সিংহের মুখওলা নল দিয়ে পড়ে, মনে হয় সিংহটা মুখ দিয়ে জল বার কচ্ছে। কিন্তু দেখ কোথাকার জল। কোথা আকাশে মেঘ হয়, সেই জল ছাদে পড়েছে, তারপর গড়িয়ে নলে যাচ্ছে; তারপর সিংহের মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে।'

একদিন গ্রামের কালীপূজায় গ্রাম্য-কোন্দলের আবহে শ্রীরামকৃষ্ণের শাশুড়ী মাতা শ্যামাসুন্দরীদেবীর সংগ্রহ করা চাল, ডাল, আলু প্রভৃতি পূজার জন্য গ্রহণ করলেন না জয়রামবাটীতে পূজাকর্তা নব মুখার্জি। ভক্তিমতী শ্যামাসুন্দরী তা সারা বছর ধরে সঞ্চয় করেছেন, দেবীকে ভোগ দেবেন। সেই নৈবেদ্য বাতিল হলো এক ফতোয়াতে। নীরবে চোখের জল ফেললেন শ্যামাসুন্দরী, 'কালীর জন্য চাল করেছি, আমার চাল নিলে না! এ চাল আমার কে খাবে! এ কালীর চাল। এ চাল তো কেউ খেতে পারবে না।' অতি সাত্ত্বিকভাবে পবিত্র নিয়মে ধান সেদ্ধ করে, শুকিয়ে, ঢেঁকিতে ভেঙে তৈরি হয়েছে এই চাল। শ্যামাসুন্দরী রাতে স্বপ্ন দেখেন টকটকে লাল এক দেবী তাঁর কাছে এসেছেন, 'ওরা চাল নেয়নি তো কি হয়েছে? কালীর চাল আমি খাব। আমি জগদম্বা, জগদ্ধাত্রীরূপে তোমার পূজা নেবো।' শ্যামাসুন্দরী তবুও বুঝতে পারেন না, কন্যা সারদাকে জিজ্ঞেস করেন, 'লাল রং, পায়ে পা ঠেসান দিয়ে ও কী ঠাকুর?' সারদা বলেন, 'ও জগদ্ধাত্রী'। শ্যামাসুন্দরী সেই বছরই জগদ্ধাত্রী পূজায় ব্রতী হলেন। মাত্র ক'দিন; কালীপূজা শেষ হয়েছে, মা জগদ্ধাত্রী আসবেন। কিন্তু প্রকৃতিতে নিম্নচাপের ভ্রুকুটি, শুরু হলো অবিশ্রান্ত বর্ষণ, কীভাবে পূজা হবে! ধানই তো শুকনো হলো না! এদিকে প্রতিমা, পূজার জিনিসপত্রও সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু তারই মধ্যে রোদ উঠলো, চাটাইয়ে ধান শুকোচ্ছে। আগুন জ্বালিয়ে প্রতিমা শুকাবার কাজ চললো। শ্যামাসুন্দরী পুত্রকে দিয়ে জামাইয়ের কাছে খবর পাঠালেন। শ্রীরামকৃষ্ণ খুশি হলেন, 'মা আসবেন? মা আসবেন? বেশ বেশ।' শ্যালক প্রসন্ন জামাইবাবুকে নিতে এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। তবে শ্রীরামকৃষ্ণ যেতে পারেননি সেবার। বললেন, 'এই আমার যাওয়া হলো। যা বেশ, পূজা করগে। বেশ বেশ তোদের ভালো হবে।' শ্যামাসুন্দরীর আয়োজনে জগদ্ধাত্রীপূজা

সাড়ম্বরে সম্পন্ন হলো।

**২. মা সারদার পূজা আয়োজন :**

মা সারদা জয়রামবাটিতে জগদ্ধাত্রীপূজার আয়োজন করতেন। মায়ের মা শ্যামাদেবীও জগদ্ধাত্রীপূজার আয়োজন করেছেন। প্রথম চার বছর সংকল্প হয়েছিল মা শ্যামাসুন্দরীর নামে। দ্বিতীয় চার বছর মা সারদার নামে সংকল্প হয়। তৃতীয় চার বছর মায়ের খুল্লতাত নীলমাধবের নামে সংকল্প হয়। এরপর মা চাইলেন পূজার আয়োজন এখানেই বরং সমাপ্ত করা যাক! কিন্তু রাতে মা স্বপ্ন দেখলেন। দেবী এসে বলছেন, 'মধু মুখুজ্যের পিসিমা আমার পূজা করতে চাইছে সারদা। তবে আমি যাই?' তিনবার একই প্রশ্ন। শ্রীমা বুঝলেন, 'তিন সত্য' করিয়ে দেবী চিরকালের জন্য ছেড়ে চলে যাবেন। মা দেবীর পা এবার জড়িয়ে ধরলেন, কিছুতেই দেবীকে ছাড়বেন না। দেবী জগদ্ধাত্রী জয়রামবাটিতে তাঁরই পূজার আয়োজনে যুগযুগান্তর ধরে বিরাজ করবেন। বছর বছর আগমন ঘটবে মায়ের ভিটেয়। শরৎ মহারাজ অনুরোধ করলেন মাস্টারমশাইকে। তিনি ৩২০ টাকা দান করলেন। পূজার সার্বিক আয়োজনে জমি কেনা হলো, প্রায় সাড়ে দশবিঘা চাষের জমি।

মা সারদা তিনদিন জগদ্ধাত্রী প্রতিমা রাখতেন। সারদা মা কত সন্তর্পণে সব জোগাড় করতেন, কালীপূজার দিন থেকে সলতে পাকাতেন। শ্রীমাকেও দেখা যেত, পঞ্চপ্রদীপের সলতে তৈরি করছেন। চালের জন্য ধান কিনিয়ে রাখছেন, ভাণ্ডার সাজিয়ে ভরে রাখছেন। ভক্তমণ্ডলীকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

স্বামী ঈশানানন্দের (বরদা) 'মাতৃসান্নিধ্যে' গ্রন্থে (উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত) উল্লেখ আছে, ১৩১৬ বঙ্গাব্দে (১৯০৯) পূজার আগেই তিনি কার্তিক মাসের শেষের দিকে এক সকালে কলকাতা থেকে জয়রামবাটির পথে গোরুর গাড়িতে রাধু ও অন্যান্যদের নিয়ে কোয়ালপাড়া পৌঁছেছেন। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে (১৯১১) জগদ্ধাত্রীপূজার দিন সকালে যখন কেদারবাবু ও রাজেনদার সঙ্গে লেখক জয়রামবাটিতে মায়ের বাড়ি যান, বাড়ি থেকে ক্ষেতের কিছু শাকসবজি পূজাপোলক্ষ্যে নিয়ে গেছিলেন। মা তা দেখে খুব আনন্দিত হলেন, বললেন, 'এখানে তরকারিপাতি সবসময় মেলে না, মাঝে মাঝে বড়ো মুশকিলে পড়তে হয়, তা ঠাকুরই তোমাদের দিয়ে সব জোগাবেন দেখছি।' এই বছর শরৎ মহারাজ কলকাতা থেকে পূজার জিনিসপত্র ব্রহ্মচারী প্রকাশ মহারাজকে দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। পূজার দিন সন্ধ্যায় শিলংবাসী ভক্ত দেবেনবাবু এবং অন্যান্যরা মা-কে ঠাকুরের শতনাম-লীলাকীর্তন শুনিয়েছিলেন। লেখকের কথায়, পূজার পরদিন সন্ধ্যায় তিনি ও সঙ্গীসাথীরা যখন কোয়ালপাড়া ফিরছেন, মা তাদের জন্য জগদ্ধাত্রীদেবীর প্রসাদ মুড়কি, নাড়ু প্রভৃতি কাপড়ে বেঁধে দিলেন। পূজা শেষে অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিকে শ্রীমা, রাধু ও অন্যান্যদের নিয়ে কলকাতায় ফিরলেন।

১৩১৯ বঙ্গাব্দে জগদ্ধাত্রীপূজার জন্য যে চাল প্রয়োজন তা জোগান দিতে কলকাতা থেকে ফেরার সময় মা সারদা কেদারবাবুকে কিছু টাকা দিয়ে বলেন, 'জগদ্ধাত্রীপূজার জন্য ধান কিনে কিছু চাল করিয়ে রাখবে।' স্বামী ঈশ্বানানন্দজী (বরদা)-র কথায় ১৩২২ সালে (১৯১৫) ভাদ্রমাসে কোয়ালপাড়ায় সবান্ধবে পনেরো দিন অবস্থান করে মা যখন জয়রামবাটিতে চলে গেলেন, যাবার আগে কোয়ালপাড়া আশ্রমের সকলকে জগদ্ধাত্রীপূজায় যোগদান করবার জন্য বিশেষভাবে বলে গেলেন। সে বছর কোয়ালপাড়া থেকে যাঁর ভাণ্ডারী হয়ে যাবার কথা ছিল, সে হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় লেখক ওই কাজের ভার নিয়ে পূজার আগের দিন জয়রামবাটিতে উপস্থিত হলেন। ভাণ্ডার হয়েছিল মায়ের ভাই কালীমামার বাড়ির পূর্বদ্বারী ঘরে। পূজার দিন সকাল থেকে মা ভাণ্ডারে মাঝে মাঝে এসে একটি বস্তার উপর পা ঝুলিয়ে বসে বরদাকে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রথম পূজা শেষ হলে পুষ্পাঞ্জলি দিতে এলেন। স্নান করে মামীদের সঙ্গে নিয়ে মণ্ডপে এলেন। তিনবার দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি হলো। তিনি গলবস্ত্রে জোড়হাত করে একধারে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তিন পর্বে পূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলে বিকেলে জয়রামবাটি গ্রামের বহু মানুষ বসে প্রসাদ পেলেন। সেবার পূজার সময় সারাদিন অল্প অল্প বৃষ্টি হয়। বরদার ঠাণ্ডা লেগে সেই রাত্রে সামান্য জ্বর হয়। পরদিন তাই তিনি সকাল থেকে ভাণ্ডার ঘরেই একধারে শুয়ে রইলেন। সেদিন ভাণ্ডারের সব কাজ সামলে নিলেন মা নিজে। বরদা সারাদিন উপবাসী, বিকেলে দেবীর প্রসাদী ফল ও সাগু এনে বরদাকে খেতে দিলেন মা। সেদিন রাতে জ্বর আর এলো না। পূজাপোলক্ষ্যে অনেক সাধু-ব্রহ্মাচারী ও ভক্তরা দূরদেশ থেকে এসেছিলেন। সন্ধ্যারতির পর সাধুভক্তেরা মায়ের বড়োভাইয়ের বৈঠকখানায় বসে ভজন গান আরম্ভ করলেন— 'মাকে দেখব বলে ভাবনা কেউ করো নাকো আর,/সে যে তোমার আমার মা শুধু নয়,/জগতের মা সবাকার।'

**৩. জগদ্ধাত্রীর নামে জমি, গৃহ, পুষ্করিণী অর্পণনামা :**

মায়ের বাড়ি জগদ্ধাত্রীর নামে অর্পণনামা করা হয়েছিল। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে (১৯১৬) জয়রামবাটিতে জ্যৈষ্ঠমাসে মায়ের এই নতুন বাড়িতে গৃহপ্রবেশের সময় উপস্থিত থাকতে পারেননি শরৎ মহারাজ। রামকৃষ্ণ মিশনের বিশেষ কাজে তাঁকে বৃন্দাবনে যেতে হয়। প্রায় মাসখানেক পরে তিনি জায়রামবাটিতে এলেন এই নতুন বাড়ি, পাশে পুণ্যপুকুর, কিছু জমি শ্রীশ্রীমা জগদ্ধাত্রীর নামে অর্পণনামা লিখে বেলুড়মঠের ট্রাস্টিদের উপর সেবা ও পরিচালনার ভার দিয়ে যাবেন। নতুন বাড়ি দেখে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করলেন মহারাজ। আষাঢ়মাস, সদলবলে শ্রীমাকে নিয়ে কলকাতা ফেরার আগে কোয়ালপাড়া আশ্রমে (মায়ের

বৈঠকখানা) একদিন বাস করে রেজিস্ট্রির কাজটি সম্পাদন করলেন। কোতলপুর থেকে রেজিস্ট্রারকে কোয়ালপাড়ায় আনা হলো। আগেই ঠিক করা ছিল— সন্ধ্যায় সাব-রেজিস্টার পালকি করে আসবেন এবং জমিটি রেজিস্ট্রি করে যাবেন। স্বামী ঈশানানন্দজীর কলমে আছে, 'রেজিস্ট্রার সাহেব আসিয়া পালকি হইতে নামিলেন। তিনি জাতিতে মুসলমান, বয়স কম, ২৭-২৮ হইবে। শরৎ মহারাজ স্থূলকায়, বয়স প্রায় ৫০-এর উপর। রেজিস্ট্রার সাহেব পালকি হইতে নামিলে তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বিশেষ সম্মানের সহিত 'আসুন আসুন' বলিয়া রেজিস্ট্রারকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। রেজিস্ট্রার আসন গ্রহণ করিলে মহারাজ বসিলেন এবং নিজেই পাখা লইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন।' শ্রীমা বাড়ির মধ্যে সকলের সঙ্গে বারান্দায় বসে রেজিস্ট্রারের দুই একটি প্রশ্নের জবাব দিলেন এবং টিপসই দিয়ে কাজ শেষ করলেন। ১৯১৬ সালের ৭ জুলাই শরৎ মহারাজের গুরুদায়িত্বে মা সারদার অর্পণনামা রেজিস্ট্রি এইভাবে সম্পন্ন হলো এবং সেখানে মায়ের জগদ্ধাত্রী পূজার পাকাপাকি ব্যবস্থা হলো।

**৪. নতুন বাড়িতে দেবীপূজার আয়োজন :**

১৩২৪ বঙ্গাব্দে (১৯১৭) জয়রামবাটিতে নতুন বাড়িতে জগদ্ধাত্রীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। সেবার মায়ের অধীর আগ্রহ। দুর্গাপূজার পরদিন থেকেই গণনা করে চলেছেন, আর এই কয়দিন আছে। সে বছর পূজার আগেরদিন রাজেনদা এবং বরদা জয়রামবাটিতে এলেন। পূজার দিন সকাল থেকে মা গলবস্ত্র হয়ে মাঝেমধ্যে প্রতিমার কাছে প্রণাম করে প্রার্থনা করছেন, যেন নির্বিঘ্নে পূজা সম্পন্ন হয়ে যায়। সেই বছর পৌরোহিত্য করলেন পুকুরিয়া গ্রামের হৃষীকেশ ভট্টাচার্য। তন্ত্রধারক হলেন মায়ের বাপের বাড়ির কুলগুরু। প্রতিমায় তিন পূজা সম্পন্ন হলো। প্রথম পূজায় নিবেদন করা হলো খিচুড়ি ভোগ, দ্বিতীয় পূজায় লুচি আর নানান রকম ভাজা, তৃতীয় পূজায় নিবেদিত হলো অন্নভোগ। আরতি ও হোম সম্পন্ন হলো। দেবীকে প্রণাম করলেন মা; কুলগুরুকেও প্রণাম করে পদধূলি নিলেন। পূজককেও প্রণাম করতে গেলে, পূজক বাঁধা দিয়ে সরে গেলেন, 'মা, আপনি আমাদের প্রণাম করছেন কি! আশীর্বাদ করুন।'

১৩২৬ বঙ্গাব্দের মাঘ মাস। যোগেন মহারাজ কলকাতা থেকে একটি কাঠের সিন্দুক বরদা এবং তাঁর সঙ্গীদের হাতে মায়ের জন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু বরদা তা দিতে ভুলে গেছেন, মাও ভুলে গেছেন। সিন্দুকটি কোয়ালপাড়াতেই পড়ে রয়েছে। মা তখন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন, বলছেন, 'জগদ্ধাত্রীর জিনিস তাতে রাখবার কথা, আমি তো ভুলেই গেছি। তোমারও ভুল হলো? সেটা কোয়ালপাড়ায় পড়ে রইল? কাল সকালে গিয়ে সব ঠিকঠাক করে নিয়ে এসো। ভোরে চলে যেও, কালই একটা ব্যবস্থা করে এসো।' পরদিন সকালে বরদা কোয়ালপাড়া গিয়ে, কোতলপুর থেকে বার্নিশ আনিয়ে সিন্দুকটি নিয়ে ঘষে বার্নিশ লাগালেন। বার্নিশ শুকালে তার পরের দিন মুটের দ্বারা জয়রামবাটিতে আনাবার বন্দোবস্ত করলেন। এবং আগের রাতেই নদীতে সাঁতার কেটে মায়ের কাছে ফিরে এলেন। অধিক রাতে নদীতে ডোঙার লোক ছিল না। সিন্দুকটি পরদিন যথাসময়ে এসে পৌঁছাল। ১২২৭ সালের (১৯২০) জগদ্ধাত্রী পূজার সময় মা আর পার্থিব শরীরে ছিলেন না। আজও মায়ের নির্দেশে ঐশ্বর্যশালিনী, রাজরাজেশ্বরী দেবী জগদ্ধাত্রীর পূজা তিন দিন ধরে হয়, প্রথম দিন ষোড়শোপচারে, পরের দুই দিন সাধারণভাবে। দেবীর দুইপাশে জয়া-বিজয়ার পূজাও হয়।

**৫. শ্রীমায়ের স্বরূপ :**

কে তিনি? তিনিই কী শ্রীরামকৃষ্ণের সারদা 'সরস্বতী'? জ্ঞান দিতে এসেছেন, রূপ গোপন করেছেন? তিনিই কি ষোড়শী ত্রিপুরাসুন্দরী, ঠাকুর যাকে পূজা করেছেন? তিনিই কী স্বামী বিবেকানন্দের 'জ্যান্ত দুর্গা'? তিনিই কী সারদা-জগদ্ধাত্রী হয়ে বসে পূজা পাচ্ছেন? কোনো ঐশ্বর্য নেই, অথচ মহাশক্তি! তিনি ধীরে ধীরে অসংখ্য মানুষের কাছে এখনও মা হয়ে উঠছেন।

শ্রীমায়ের গ্রামে জগদ্ধাত্রী পূজা হচ্ছে। মা তখন ছোট্ট বালিকা। জয়রামবাটির হলদেপুকুরে রামহৃদয় ঘোষালের পূজামণ্ডপ; গ্রামের রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা, ছোট্ট মেয়ে নিবিষ্টমনে ধ্যান করছে। রামহৃদয়বাবু দেখছেন, জগদ্ধাত্রীর সম্মুখে যেন আর এক জগদ্ধাত্রী! দেবীর সম্মুখ যেন মানবী নয়, দুজনেই দেবী! তিনি আচমকা বলে উঠলেন, 'ও সাধারণ নয়। ও জগদ্ধাত্রী! একদিন মানুষ ওর পূজা করবে।'

১৩২৬ বঙ্গাব্দের (১৯১৯) দুর্গাপূজায় জয়রামবাটিতে রয়েছেন মা। অনেক পদ্মফুল তুলে এনেছেন মায়ের ভক্তেরা। মা কতকগুলি ফুল থালাতে সাজিয়ে চন্দন, ধূপ দিয়ে, আর একটি থালায় ফল, মিষ্টি, সিঁদুর সাজিয়ে প্রিয় ভক্তদ্বয়কে (বরদা ও হরি) পাঠালেন সিংহবাহিনীর পূজা দিয়ে আসতে। মা নিজের ট্রাঙ্ক নামিয়ে দুইখানা নতুন লাল নরুন-পাড় ধুতি বের করে দিয়েছেন তাদের। সন্ধিপূজার সময় তক্তাপোশে পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। ভক্তরা তাঁর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছেন। মা বললেন, আরও ফুল এনে রাখাল, তারক, শরৎ, খোকা, যোগেন, গোলাপ প্রমুখের নাম করে ফুল দিতে; জানা-অজানা সব ছেলেদের হয়ে, সকলের হয়ে ফুল দিতে বললেন বরদাকে। শ্রীমা জোড়হাতে ঠাকুরের ছবির দিকে চেয়ে আছেন, আর বলছেন, 'সকলের ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল হোক। ঠাকুর, তুমি সকলকে দেখো।

**তথ্যসূত্র :**

১. শ্রীম কথিত শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (অখণ্ড), উদ্বোধন। ২. শিবের শক্তি জীবের জননী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, উদ্বোধন। ৩. মাতৃসান্নিধ্যে, স্বামী ঈশানানন্দ, উদ্বোধন।

# একাত্ম মানবদর্শন—বিজ্ঞানসম্মত একটি দর্শন

**ডাঃ সুভাষ সরকার**

একাত্ম মানবদর্শনকে সহজ সরলরূপে উপস্থাপনা করার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ছিলেন একজন আদর্শ স্বয়ংসেবক, আদর্শ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, আদর্শ রাজনীতিজ্ঞ। ভারতের দর্শন ও সংস্কৃতিকে তিনি অনুভব করেছেন বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ- মহাভারত এবং সর্বস্তরের মানুষকে অধ্যয়নের মাধ্যমে।

একাত্ম মানবদর্শনের উপর প্রথম দীনদয়ালজীর বক্তব্য ছিল ১৯৬৪ সালের ৪ জুন রাজস্থানের উদয়পুর সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে। বিষয় ছিল 'ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দৃষ্টির অন্তর বা ব্যবধান'। দেশ ও বিশ্বের সমস্ত একককে সুখী, বৈভবশালী ও সুরক্ষিত হওয়ার ছবিটি ঠিক কেমন?

পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে জাগতিক সুখই সর্বস্ব। আর সেই দৃষ্টিতেই তৈরি হয়েছিল পুঁজিবাদ, সাম্যবাদ বা সমাজবাদ। অথচ হাজার হাজার বছর আগেই এই দেশ শরীর, মন, বুদ্ধি, আত্মা ও পরমাত্মার অনুভব করেছে। একটি ছাগলকে সিংহের সামনে রেখে ভালো ভালো খাবার দিলেও দেখা গেছে ছাগলের ওজন কমে যায়। অর্থাৎ শরীর ও মন একে অপরের পরিপূরক। বুদ্ধিও তার সঙ্গে যুক্ত হয়। বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞান শরীর, মন ও বুদ্ধির সম্পর্ক ও অস্তিত্ব স্বীকার করে।

দীনদয়ালজী সমাজকে একটি প্রাণবন্ত অস্তিত্ব বলে বর্ণনা করেছেন। মাটির সঙ্গে যেমন বৃক্ষের সম্পর্ক, তেমনই সম্পর্ক হয় একটি ভূখণ্ডের ওপর কয়েক হাজার বছরের বসবাসকারী মানবসমূহের সেই ভূখণ্ডের সঙ্গে। ভারতে হাজার হাজার বছর ধরে তৈরি হয়েছে বিজ্ঞানসম্মত এই সংস্কৃতি। দীনদয়ালদজীর কথায় পাশ্চাত্যে ভৌতিক বা পার্থিব চিন্তা থেকে আসে সমতা, আর ভারতে আসে একাত্মতা। পরের দিন ৫ জুন ১৯৬৪ ওই একই সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের বৌদ্ধিকে যে বিষয় উপস্থাপন করেছিলেন তা সারা পৃথিবী কাঁপানো যুগান্তকারী বিষয়, তা হলো 'ব্যক্তি ও সমাজ'। ব্যক্তির যেমন শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মা আছে, ঠিক তেমনই সমাজেরও শরীর (জন), মন (সংকল্প), বুদ্ধি (একটি ব্যবস্থা) ও আত্মা (একটি আদর্শ) আছে।

সমাজের প্রাণবন্ত অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি বলেছেন, পৃথিবীতে সমাজের একটি বড়ো একক হলো রাষ্ট্র। প্রথম আবশ্যকতা হলো 'দেশ'। দেশ হচ্ছে ভূমি ও জনগণের সমষ্টি। দ্বিতীয় আবশ্যকতা, সবার ইচ্ছাশক্তি বা সংকল্প, যেখানে সকলে এই ভূমির সঙ্গে 'মা'-এর সম্পর্ক অনুভব করেন। তৃতীয় বিষয় হচ্ছে একটি ব্যবস্থা, যাকে আমরা সংবিধান বা ধর্ম বলতে পারি। চতুর্থ বিষয়, জীবনাদর্শ বা সংস্কৃতি। সমাজের প্রতি একাত্মতা অনুভবের উদাহরণ এভাবে দেওয়া যেতে পারে—১ হাজার টাকা রোজগার করলে সাতশো টাকার খাওয়ার জন্য খরচ করে তিনশো টাকা সঞ্চয় করি। সঞ্চয় বৃদ্ধি করার জন্য আরও বাঁচাতে পারি কিন্তু অন্য মানুষের জন্য, প্রাণীর জন্য, প্রকৃতি সংরক্ষণের জন্য ভারতীয়রা খরচ করে।

অনেকে প্রশ্ন করবেন হয়তো তাহলে সমাজের সব থেকে গরিব ব্যক্তিটি কি দয়ার ওপর নির্ভর করবে? একদম না। যেখানে প্রাণবন্ত একাত্মতা থাকে সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই অভ্যুদয় হয় অন্ত্যোদয়ের ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্প ও ব্যবস্থা। তার মধ্য দিয়েই সব থেকে পিছিয়ে থাকা মানুষও ক্রমাগত অর্থনৈতিক শক্তি সঞ্চয় করবে। আজ থেকে ৬০ বছর আগে দীনদয়ালজী সমাজের ন্যূনতম চাহিদা সম্পর্কে

বলেছিলেন—

১. জন্মেছেন এমন প্রত্যেক জনের জন্য ভরণপোষণের ব্যবস্থা।

২. মাথার ওপর পাকা আচ্ছাদন।

৩. স্বাস্থ্য সুরক্ষা।

৪. শিক্ষা ও দক্ষতার বিকাশ, যার মাধ্যমে জীবিকা উপার্জন সম্ভব।

জীবিকার মাধ্যমে উপার্জনের ব্যবস্থা না হলে সমাজ তাদের ভরণপোষণ করবে। আজ থেকে ৬০ বছর আগে দীনদয়ালজী চাকরি না পাওয়া মানুষের ভরণপোষণ সমাজ নেবে— এই কথা বলতে পেরেছিলেন। আর সেটা সম্ভব হয়েছিল 'সমাজ'-এর জীবন্ত সত্তা 'একাত্ম মানবদর্শন' বোধের মাধ্যমে। এরপর ২২ এপ্রিল ১৯৬৪ সালে ভারতীয় জনসঙ্ঘের অধিবেশনে তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল 'রাষ্ট্র' সম্পর্কে সম্যক ব্যাখ্যা। আমরা অনেক সময়েই পাশ্চাত্যের গত হাজার বছরের উন্নয়নের কথা কল্পনা করে 'আফশোস করি। এই হাজার বছর আমাদের পরাধীনতায় কেটেছে। সব রকম ক্রিয়া এবং তার প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই পাশ্চাত্যের দর্শন বা মতবাদের উদ্ভাবন হয়েছে।

আমাদের দর্শন 'একাত্মতা', 'প্রাণসত্তা' বা 'স্ব'-এর অনুধাবন। ইউরোপে রোমান সাম্রাজ্যের পতন এবং চার্চের প্রতি বিদ্রোহের কারণে--- নেশন-স্টেটের উদয়। ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়ার ইতিহাস অনুধাবন করলে বোঝা যায়— Nations die in peace & Nation evolves in War. ঋণাত্মক ও প্রতিক্রিয়ামূলক চিন্তার তাড়নায় জন্ম নিয়েছিল, তাদের ভূখণ্ড দখল ও উপনিবেশ স্থাপন।

সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, সাম্যবাদ বা সমাজবাদের অবতারণাও একইভাবে। পাশ্চাত্যে বিভিন্ন ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে 'প্রজাতন্ত্র' বা 'গণতন্ত্রের' জন্ম হয়। কিন্তু আমাদের 'স্ব', সমাজ ও ব্যক্তির প্রাণসত্তা ও একাত্মতা'র মধ্য দিয়েই আমাদের রাষ্ট্রভাবনা—যা দেশের মানবকুল, প্রাণীকুল ও প্রকৃতির উন্নয়ন করে। আমাদের এই রাষ্ট্রবোধের গুণাবলী প্রয়োগের সীমা কেবল নিজের দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। জগতের কল্যাণে মহাবিশ্বে তার প্রয়োগ হচ্ছে। আমাদের জেনে রাখা উচিত 'ভারত'ই 'The Mother of Democracy'।

২৩ এপ্রিল, ১৯৬৫ দীনদয়ালজী 'একাত্ম মানবদর্শনের কেন্দ্রীভূত শব্দসমূহ রাখলেন। বিভিন্ন বিন্দুর মধ্যে ছিল— ১. বিদেশি বিচার সর্বজনীন বা সার্বলৌকিক নয়। ২. আমাদের নিজের দেশ এবং তার পরিস্থিতি। ৩. বিশ্বে উদ্ভূত বিভিন্ন ধারণা বা মতবাদের সংঘর্ষ। ৪. ভারতীয় সংস্কৃতি হলো একাত্মমুখী। ডারউইনের তত্ত্ব বা survival of the fittest-কে জঙ্গলের বিধান আখ্যা দিয়েছেন, কারণ সমগ্র পৃথিবীতে যত সংঘর্ষ দেখা গেছে তার থেকেও বেশি সহযোগিতার উদাহরণ আছে।

একাত্মতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো, একটি বীজের মধ্যে একটি গাছ, এর মূল, কাণ্ড, শাখা পাতা, ফুল ও ফল সব সমাহিত আছে বা একাত্ম আছে। অর্থের 'অভাব' ও 'প্রভাব' কোনোটিই যেন না থাকে, ঠিক তেমনই দণ্ডনীতি পর্যন্ত বাদ দেননি।

ক্ষীণদণ্ড বা উগ্রদণ্ডর পরিবর্তে মৃদুদণ্ডর ব্যবস্থা যেন থাকে। ২৪ এপ্রিল, ১৯৬৫-তে পণ্ডিত দীনদয়ালজী একাত্ম মানবদর্শনের প্রয়োগক্ষেত্র সমাজ ও ব্যক্তি সম্পর্কে অসাধারণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উপস্থাপন করলেন অগণিত তথ্যের মাধ্যমে। যার মূল কথা হলো— 'মানুষের যেমন জন্ম হয়, তেমন সমাজেরও জন্ম হয়'। কিছু ব্যক্তি মিলিত হলেই সমাজ সৃষ্টি হয় না। সমাজ কোনো ক্লাব নয়, রেজিস্টার্ড সোসাইটি নয়, কো-অপরারেটিভ সোসাইটি নয়, জয়েন্ট স্টক কোম্পানিও নয়। বাস্তবতায় সমাজেরও আত্মা আছে এবং একটি জীবন আছে, আর এই কারণেই ভারতীয় সমাজ একটি জীবন্ত সত্তা। ঠিক মানুষ যেমন একটি জীবন্ত সত্তা। এটাই হচ্ছে পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারতের ভাবনার পার্থক্য। পাশ্চাত্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা সর্বোপরি। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে রাজনৈতিক শক্তিসম্পন্ন সরকার বা প্রশাসন হলো অন্যান্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার মধ্যে একটি। অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রাণ রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে নিহিত থাকেনি এবং থাকবেও না। অত্যন্ত অকপট ভাষায় তিনি বলেছেন--- 'রাজনীতির প্রতি উদাসীনতাও রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকারক', এরকম দেশ হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং থাকবে শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ।

পণ্ডিত দীনদয়ালজীর একাত্ম মানবদর্শনের কাছে যতরকম বাদ আছে সব ধরাশায়ী হয়েছে এবং হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদ জীবন্ত সমাজের (রাষ্ট্রের) স্বতঃপ্রতিরোধে ক্রমাগত সংকুচিত হয়ে এখন সমাপ্তির পথে। পুঁজিবাদও টুকরো ভাবনা থেকেই জন্ম নিয়েছে। যাদের কাছে অর্থ আছে তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অর্থ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা মাত্র। বহুবছর আগে আমেরিকাতে প্রথম আলুর খোসা ছাড়ানো ছুরি (পিলার) তৈরি হয়ে বাজারে এল। প্রচুর বিক্রি। সেই দেখে আরও নতুন নতুন কোম্পানি পিলার তৈরি করল এবং সেগুলি দেখতেও ভালো। এবারে প্রয়োজনের তুলনায় পিলার উৎপাদন বেশি হয়ে গেল। ফলে বিক্রি কমে গেল। তখন উৎপাদকেরা ঠিক করলেন পিলারের রং আলুর খোসার রঙে তৈরি করবে। এর ফলে যারা সবজি কাটবে তারা ছাড়ানোর খোসার মধ্যে পিলারকে হারিয়ে ফেলবে। অর্থাৎ পিলার নষ্ট হওয়ার আগেই আবার কিনতে হবে। আমাদের দেশে হলে কী হতো, একবার ভাবুন। আমরা তো সবজির খোসা গোরু, ছাগলের জন্য তুলে রাখি, অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ গোরু ছাগলের মুখ ওই পিলারে কেটে যেত। প্রশ্ন হলো, মানুষের জন্য পিলার না পিলারের জন্য মানুষ?

আবার আর একটি প্রতিক্রিয়াতে জন্ম নিয়েছিল সাম্যবাদ। অর্থাৎ প্রোলেটারিয়েতের ডিক্টেটরশিপ বা সর্বহারার প্রভুত্ব বা একটি অন্য ধরনের একনায়কতান্ত্রিক শাসন। সেখানেও দেখেছি শাসক নামে নতুন শোষকের জন্ম। এখানেও সেই টুকরো অংশের চিন্তা অর্থাৎ কেবলমাত্র শ্রমিকের চিন্তা। দীনদয়ালজীর বক্তব্যের ষাট বছরের মধ্যে এক এক করে বহু তথাকথিত সাম্যবাদী অর্থব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। সেই সময়ে ২৫ এপ্রিল ১৯৬৫ সালে একাত্ম মানবদর্শন এবং 'যুগানুকূল অর্থ-রচনা' বিষয়ক প্রেরণাদায়ক বক্তব্য রেখেছিলেন। প্রকৃতির সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার কোনোমতেই

হওয়া উচিত নয়— এই মত তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এছাড়াও তিনি বলেন যে প্রকৃতিকে দোহনের মাধ্যমে অর্থব্যবস্থা রচনা করতে হবে।

সমাজের যেহেতু প্রাণ আছে— তাই অর্থব্যবস্থায় থাকবে (১) ব্যক্তিগত মালিকানা (অতি ছোটো, মাঝারি, বড়ো), (২) প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, (৩) পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, (৪) কো-অপারেটিভ, (৫) সরকারি কোম্পানি। সরকার সবকিছু নিয়ন্ত্রণ না করে সমন্বয় ও উৎসাহিত করবে।

একটি উদাহরণ : কলকাতায় একজন মিষ্টির দোকানি ৪০ কেজি ছানার রসগোল্লা তৈরি করে। তার গুণমান অসাধারণ। রাত্রি সাড়ে ৮টার মধ্যে বেশিরভাগ মিষ্টি বিক্রি করে রাত্রি ন'টা-তে বাড়ি চলে যায়। এর থেকে বেশি মিষ্টির চাহিদা থাকলেও ওই দোকানি কিন্তু বানাবে না। সে ওই রোজগারেই সন্তুষ্ট। আমরা কিন্তু তাকে জবরদস্তি ব্যবসা বৃদ্ধি করতে বা অন্যকে হস্তান্তর করতে বলতে পারি না। কারণ সে এতেই খুশি। আজ থেকে ৬০ বছর আগে শিল্প করতে গেলে ৭টি 'এম'-এর প্রয়োজন দীনদয়ালজী ব্যক্ত করেছিলেন। যা আজ সারা বিশ্ব বা ম্যানেজমেন্ট গুরুরাও মান্যতা দেন। (1) M—Men, (2) M—Material, (3) M—Motor Power, (4) M—Machine, (5) M—Marketing, (6) M—Money, (7) M—Management.

উপরের সাতটি ব্যবস্থাই সমান গুরুত্বপূর্ণ। এবারে ব্যক্তির চাহিদা কেমন হবে সেটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রত্যেকটি ব্যক্তির সমস্তরকম ন্যূনতম চাহিদা পূরণ হতে হবে। 'একাত্মমানব' দর্শনে একক মানুষের যেমন একটি জীবন তেমনই রাষ্ট্রের সকল মানুষ সহ সমাজও একটি একাত্ম জীবন।

একাত্ম সমাজের লক্ষ্য কী? (১) কেউ না খেয়ে থাকবে না, (২) সকলে শিক্ষা পাবে, (৩) সবার স্বাস্থ্য সুরক্ষা পাবে, (৪) মাথার ওপরে আচ্ছাদন (পাকা ছাদ) থাকবে। ন্যূনতম এইগুলি তো প্রাপ্ত হতেই হবে— কিন্তু আসবে কোথা থেকে?

প্রথম চেষ্টা করা উচিত— প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পুরুষার্থ অর্থাৎ দেহ, মন, বুদ্ধির সাহায্যে রোজগারের মাধ্যমে। মানুষের হাত ও পেট দুই-ই আছে। পেটের খাবার যদি পেয়ে যায়, কিন্তু হাতের জন্য কাজ না পায় তাহলে কিন্তু মানুষের বিকাশ হবে না। এই কষ্ট অনেকটা বিত্তবান ব্যক্তির নিঃসন্তান স্ত্রী'র মনের ব্যথার মতো। সেই সময় তিনি লক্ষ্য করেছিলেন কোথাও ১০ বছরের বালক, আবার কোথাও ৭০ বছরের বয়স্ক ব্যক্তি কাজ করছেন, কিন্তু ২৪ বছরের যুবক কাজ না পেয়ে বসে আছে। এই যুবককে পুঁজি ও অন্যান্য সহযোগ দিয়ে উৎপাদক বানানোর মতো আধুনিক বা আজকের উপযোগী কথা বলেছেন। সমাজে সেবক শিশু, বালক, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, রোগী আছে তাদের তো খাওয়াতে হবে। পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদ বলে উপার্জনকারীই খাবে। ভারতীয় দর্শন বলে উপার্জনকারী সবাইকে খাওয়াবে। ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের মিলিত অবস্থাই হচ্ছে একাত্ম জীবন। চোখ বুজে এবং আর একবার চোখ খুলে যেন অনুভব করি— সকলের তরে সকলে আমরা, সবাই আমরা পরের তরে। তাহলেই পণ্ডিত দীনদয়ালজী পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার ৬টি উদ্দেশ্য আমাদের প্রণিধানযোগ্য হবে তা হলো—

(১) প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যূনতম জীবন স্তর এবং তাদের সব ধরনের চাহিদাপূর্তি। এবং দেশের পূর্ণ সুরক্ষা ও সামর্থ্যের ব্যবস্থা।

(২) এই ন্যূনতম স্তর অতিক্রম করার পরে সকল ব্যক্তির এবং দেশের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ জারি রাখা। ব্যক্তির সঞ্চিত সম্পদ দ্বারা অন্য ব্যক্তির উন্নয়ন এবং দেশের সঞ্চিত অতিরিক্ত সমৃদ্ধির দ্বারা বিশ্বের প্রগতি সাধন।

(৩) প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বৃত্তিজীবন থেকে অবসর নেবেন এবং সকলে যেন প্রাকৃতিক সম্পদকে মিতব্যয়িতার সঙ্গে ব্যবহার করেন--- সেই মর্মে সমাজকে নিয়মিত স্বেচ্ছায় প্রশিক্ষণ দেবেন।

(৪) দেশের উৎপাদিত বস্তুসমূহ ও উৎপাদকদের সঙ্গে চর্চা ও বিচারের মাধ্যমে সমাজ ও উৎপাদক-অনুকূল উদ্যোগের ব্যবস্থা করা।

(৫) আগের চারটি বিষয় অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন এবং এর সঙ্গে সমাজের সাংস্কৃতিক জীবন ও মূল্যবোধকেও রক্ষার লক্ষ্যে সকলের আত্মনিবেদন।

(৬) বিভিন্ন প্রকার উদ্যোগের মালিকানার মধ্যে ব্যবহারিক সমন্বয় নির্ধারণ করবে দেশীয় সরকার ও সমাজ। একাত্ম মানবদর্শনের ব্যবহারিক প্রয়োগ আমাদের দেশের সরকার প্রারম্ভ করেছে। আমরাও যেন প্রত্যেকে হৃদয়ঙ্গম করে একটি একটি পর্ব নিজের জীবনে ব্যবহারিক প্রয়োগ করি। তাহলেই আমাদের হৃদয় বিশাল হবে এবং দেশের হৃদয় বিশাল থেকে 'বিশালতর' হবে। সেইদিন ভারত কেবল বিশ্বে নয়, মহাবিশ্বের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হবে। □

উঠেছিল ঠিক তখনই একদিন কর্মক্ষেত্রে মীনা কুমারীর রহস্যজনক মৃত্যু রামবাবুকে প্রতিবাদে সোচ্চার হতে সাহস যোগায়। ভয়ানক দুর্নীতি ও দুষ্কর্মের নেপথ্যে থাকা মানুষদের চিনে ফেলায় মীনা কুমারীর মৃত্যুর ঘটনা জীবন সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শেখায় রামবাবুকে।

রামবাবু কি বাঙ্গালির বিবেক? বহু বছর ধরে সীমাহীন অত্যাচার ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে বাঙ্গালি যখন ভুলে গিয়েছিল, তখন অভয়ার মৃত্যু বাঙ্গালিকে সাহস যুগিয়েছে। এই নাটকে এক বালিকাকে দেখা গিয়েছে যে একটি ধনুকে ছিলা পরানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মীনা কুমারীর মৃত্যুর ঘটনার পর সেই ধনুকে সে ছিলা পরাতে সমর্থ হয় এবং তা তুলে দেয় রামবাবুর হাতে। অর্জুনের গাণ্ডীবের মতো শ্রীরামচন্দ্রের ধনুকের কোনো নাম নেই। তবে রাজর্ষি জনকের কাছ থেকে প্রাপ্ত বরুণ দেবের দু'টি ধনুক ছিল তাঁর। আবার ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শার্ঙ্গ ধনুকের অধিকারীও তিনিই ছিলেন। এই দিব্যাস্ত্র দিয়েই রাবণ বধ করতে পেরেছিলেন শ্রীরাম। 'রামবাবু' নাটক কি বাঙ্গালির হাতে সেই দিব্যাস্ত্র? জানি না। এই উত্তর ভবিষ্যৎ দেবে, তবে নয়াবাদ তিতাসের এই বলিষ্ঠ প্রযোজনা

# নয়াবাদ তিতাসের নতুন নাটক 'রামবাবু'

**প্রবীর ভট্টাচার্য্য**

আর.জি.কর মেডিক্যাল কলেজে এক অনামী তরুণী চিকিৎসকের উপর মর্মান্তিক অত্যাচার ও হত্যার ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর রাজ্যের শাসকের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ও প্রতিবাদে গর্জে ওঠে বঙ্গবাসী। ওই তরুণী চিকিৎসক প্রশাসনের নানা দুর্নীতি ও দুষ্কর্ম জেনে ফেলায় তাঁকে চরম অত্যাচার করে হত্যা করা হয়। এই সংবাদ প্রকাশ্যে আসার পর হাজার হাজার মানুষ যেভাবে পথে নেমেছেন তা অবর্ণনীয় ও অভূতপূর্ব। চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকা গৃহবধূ যিনি হাতা-খুন্তি ও চায়ের কেটলির বাইরের জগৎ সম্পর্কে অজ্ঞ না হলেও ছিলেন উদাসীন, তিনিও মধ্য রাতে বাড়ির বাইরে এসে শঙ্খধ্বনি করে জনগণকে তৈরি হওয়ার ডাক দিয়েছেন। কিন্তু, কী করে পেলেন এঁরা এই সাহস? এ নিয়েই নয়াবাদ তিতাসের নতুন নাটক 'রামবাবু'। জীবনের প্রতি মায়া ও মোহ ত্যাগ করা রামবাবু আত্মহননের পথ বেছে নিলেও মৃত্যু তাঁকে বেছে নেয়নি। বরং তাঁর একাকী জীবনে আকস্মিকভাবেই যুক্ত হয়ে যান বাল্যবন্ধু শ্যামবাবু, প্রতিবেশী মধুবালা এবং তাঁর চিকিৎসক কন্যা মীনা কুমারী। স্ত্রী-পুত্র হারানো একাকী রামবাবুর জীবন যখন আবার হাসি ঠাট্টায় মেতে

দীর্ঘদিন মানুষ মনে রাখবে। রামবাবু, শ্যামবাবু ও মধুবালার চরিত্রে কৌশিক চট্টোপাধ্যায়, অভিজিৎ রায় ও শর্বরী মুখোপাধ্যায়ের অনবদ্য অভিনয় নাটকটিকে টান টান করে বেঁধে রাখতে সমর্থ হয়েছে। এর বাইরে জনা কুড়ি কলাকুশলীর প্রাণবন্ত উপস্থাপনা দর্শকদের চোখের পলক ফেলতে দেয়নি। এই নাটকের মধ্য দিয়ে নাট্যকার, নির্দেশক আবিরের প্রতি বাঙ্গালির আকাঙ্ক্ষা শতগুণে বেড়ে গেল। অতীতের সমস্ত কাজকে ছাপিয়ে আবিরের এই নাটক আগামী দিনে বাঙ্গালির নতুন ইতিহাস গড়তে পারে কিনা তা ভবিষ্যৎ বলবে, তবে নাটকের ইতিহাসে 'রামবাবু' চাপা পড়ে যাবে না, এটা হলফ করে বলা যায়।

গল্প

# মান্ধাতার কথা

বিখ্যাত ইক্ষ্বাকুবংশের কথা তোমাদের জানাই আছে। সেই যে ধুন্ধু দৈত্য— যার ভয়ে ঋষি উত্তঙ্কের যাগ-যজ্ঞ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেই ভয়াবহ দৈত্যকে বধ করেছিলেন সেই রাজা কুবলয়াশ্ব। তিনি ইক্ষ্বাকুবংশেরই একজন।

এই বিখ্যাত বংশেই জন্মেছিলেন রাজা যুবনাশ্ব। এই কাহিনি যুবনাশ্বকে নিয়েই।

যুবনাশ্বও ছিলেন খুবই গুণী রাজা।

তার সুশাসনে রাজ্যে প্রজাদের কোনো অভাব ছিল না, কোনো অভিযোগ ছিল না।

নিশ্চিন্তে আর পরম সুখেই কাটতো তাদের দিন।

যুবনাশ্বের মনেও প্রজাদের সুখে সুখ যথেষ্টই ছিল। তাদের সুখে তিনি সুখী থাকতেন, তাদের দুঃখ দেখলে নিজেও দুঃখ ভোগ করতেন।

এত কিছুর মধ্যেও রাজার মনে কিন্তু একটা অশান্তি ছিল। প্রজারাও সেকথা জানত। তাদের মনেও সেই নিয়ে আক্ষেপ কম ছিল না।

ব্যাপারটা হলো, যুবনাশ্ব পুত্রহীন। একজন নয় দু'জন নয়, একশত রানি তার। সব দেশ বিদেশের নামকরা রাজার সুন্দরী কন্যা তারা। কিন্তু কারুরই কোনো সন্তানাদি ছিল না, সেই নিয়ে চাপা দুঃখ ছিল রানিদের মনেও।

সন্তান হবে হবে করে রাজা, রানি আর প্রজারাও সেই সঙ্গে অনেক দিন আশায় আশায় থাকলেন। অনেক কয়টা বছর যখন কেটে গেল সত্যিই রাজার আর কোনো সন্তান হলো না, তখন সকলেই হতাশ হয়ে পড়ল।

প্রজারা মন্দিরে মন্দিরে রাজার সন্তান কামনায় যত পূজা যজ্ঞ করালো সবই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলো।

রানিরা ব্রত উপবাসে কতদিন কষ্ট করল, ঈশ্বরের কাছে চোখের জল ফেলল, কিন্তু বিফল হলো সব কিছুই। রাজার ভাগ্যে নেই পুত্রমুখ দেখা। কী হবে এতো সবে।

তা যুবনাশ্বও শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে পড়লেন। ছেলে হলে তাকে সিংহাসনে বসিয়ে শেষ বয়সটা তিনি রানিদের নিয়ে ভগবানের নাম গুণগান করে কাটাবেন— এই ছিল তার মনের ইচ্ছা। অনেক অপেক্ষা করেও তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে তার ইচ্ছা আর পূরণ হবে না তখন চিন্তা ভাবনা করে স্থির করলেন, আর কেন, বয়সও হয়ে যাচ্ছে সময় নষ্ট না করে এবার ঈশ্বরের দিকেই মন দেওয়া ভালো।

যুবনাশ্ব রানিদের ডেকে মনের বাসনা জানালেন।

রানিরা সকলেই রাজাকে ভালোবাসতেন। তাই তারা জানালেন— মহারাজ, আমরা আর কি বলব, আপনার ইচ্ছাই আমাদের ইচ্ছা।

শুভদিন দেখে যুবনাশ্ব তার মন্ত্রী পাত্রমিত্রদের হাতে রাজ্য- শাসনের ভার দিয়ে রানিদের নিয়ে বনে চলে গেলেন।

বনে ঋষিদের তপোবনের কাছে যুবনাশ্বও নিজেদের জন্য সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে বাস করতে লাগলেন আর ঋষিদের মতো ঈশ্বরের চিন্তায় ফলমূল খেয়ে দিন কাটাতে লাগলেন।

কিছু দিনের মধ্যেই ঋষিদের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল যে রাজা যুবনাশ্ব পুত্রের অভাবে মনের দুঃখে রাজ্য ছেড়ে বনে চলে এসেছেন।

ঋষিদের কোমল প্রাণ, পরের দুঃখে সহজেই তাঁরা কাতর হয়ে পড়েন। রাজা যুবনাশ্বর জন্যও তারা খুব ব্যথিত হলেন। কি করে রাজার দুঃখ দূর করা যায়, অমন যে প্রজাবৎসল গুণীরাজা— তার দুঃখ দূর করবার কোনো ব্যবস্থাই যদি তাঁরা করতে না পারলেন তাহলে বৃথাই জপতপ করলেন। তখনই ঋষিরা স্থির করলেন রাজার পুত্র-কামনায় যজ্ঞ করবেন। যজ্ঞের দেবতাদের তুষ্ট করে রাজার জন্য পুত্র চেয়ে নেবেন।

ঋষিরা রাজাকে তাঁদের মনের বাসনা জানালেন। শুনে রাজা আর তাঁর একশত রানি সকলেই খুশি হলেন।

রাজার আদেশে যজ্ঞের সব আয়োজন অল্প সময়ের মধ্যেই হয়ে গেল। ঋষিরা সমবেত হয়ে যজ্ঞস্থলে যজ্ঞে বসলেন।

একে একে অনেকদিন একটানা যজ্ঞ হলো। মনে মনে ঘি আর সমীধ পুড়ল। ফুল ফল যে কত আহুতি পড়ল তা আর কি বলব।

যজ্ঞস্থলে একটি জলপূর্ণ কলসী রাখা হয়েছিল। যজ্ঞে দেবতাদের আশীর্বাদ লাভ

হলে সেই কলসীর জল ঋষিদের মনস্কামনা পূর্ণ করবে। রানিদের সেই জল খাইয়ে দিলেই তারা মনের মতো সন্তান লাভ করবেন।

যজ্ঞের কাজ ভালোভাবেই সম্পন্ন হলো। ঋষিরা পরমেশ্বরের জয়ধ্বনি দিয়ে যজ্ঞের কাজ শেষ করলেন। দীর্ঘ কয়দিনের পরিশ্রমের পর সকলে বিশ্রাম করতে গেলেন। উপবাসী রাজাও প্রাণ শেষ করে যজ্ঞস্থলের কাছেই বিশ্রামে গেলেন।

যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয়েছে--- পুত্রলাভ করবেন এই চিন্তায় রাজার মনে আনন্দ। রানিরা প্রাসাদে উৎফুল্লা। সকলেই অপেক্ষায় আছেন রাত শেষ হয়ে সকাল হলেই তারা যজ্ঞের পবিত্র বারি পান করবেন। প্রত্যেকেই দেবতাদের আশীর্বাদে মনের মতো সন্তান লাভ করবেন।

দিন গিয়ে রাত হলো। আর সেই রাতেই ঘটল একটা অঘটন।

মাঝরাতে রাজা যুবনাশ্বর ঘুম ভেঙে গেল। প্রচণ্ড তেষ্টায় তখন গলা শুকিয়ে উঠেছে। তিনি তো প্রাসাদের বাইরে--- যজ্ঞস্থলে এখানে কে তাঁকে জল দেবে। অথচ তৃষ্ণা এমন প্রবল যে স্থির হয়ে বসতে পারছেন না।

অগত্যা তিনি পায়ে পায়ে উঠে এসে যজ্ঞস্থলে ঢুকলেন, যদি কোথাও জল পাওয়া যায়।

যজ্ঞের কলসীটি একপাশেই সরিয়ে রাখা ছিল। রাজা সেটা জানতেন না। তিনি জানতেন— কলসী যজ্ঞকুণ্ডের পাশে যেমন ছিল তেমনই আছে। তিনি ভাবলেন এটি অন্য কাজের ব্যবহারের জন্য রাখা ছিল— এই ভেবে প্রবল তৃষ্ণার ঘোরে কলসীর সব জল ঢক্ ঢক্ করে গলায় ঢেলে তৃষ্ণা নিবারণ করলেন।

তারপর শান্ত হয়ে বিছানায় এসে আবার শুয়ে পড়লেন।

এদিকে সকাল হতেই ঋষিরা রানিদের স্নানে পাঠালেন। যুবনাশ্বের একশত রানি সুগন্ধী তেল মেখে সরোবরের জলে স্নান করে নতুন কাপড় পরে যজ্ঞস্থলীতে এলেন। এবারে তাঁরা যজ্ঞের পবিত্র জল পান করবেন। সকলের হাতেই একটি করে জলপাত্র।

জলের কলসী তুলতে গিয়েই ঋষিদের তো চক্ষুস্থির। কলসী ফাঁকা। একফোঁটা জলও তার তলায় পড়ে নেই। কাণ্ড দেখে তাদের তো মাথায় হাত। রাতারাতি কলসীর জল কোথায় মিলিয়ে গেল? কেউ কি ফেলে দিল ভুল করে?

রাজা যুবনাশ্ব শুনেই ছুটে এলেন। তিনি তো হতভম্ব সব শুনে। বিষণ্ণ মনে রাত্রের ঘটনা জানালেন। সব শুনে ঋষিদের তো মাথায় হাত। সর্বনাশ— ওই জল যে পান করবে তার পেটেই সন্তান জন্মাবে। ঋষিরা বললেন, মহারাজ, কিছু আর করার নেই। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। পবিত্র বারির ফল আপনাকেই বহন করতে হবে। তবে ভয় নেই আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। কি আর করা! এমন একটা দুর্ঘটনা উপস্থিত সকলকেই হতভম্ব করে রাখল কিছুদিন। তারপর সকলেই অপেক্ষা করতে লাগল— কি হয়।

দেখতে দেখতে দশ মাস কেটে গেল। ইতিমধ্যে রাজা যুবনাশ্বের পেটে সন্তান বড়ো হয়ে উঠেছে। যথা সময়ে তার পেটের ডান পাশ ভেদ করে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হলো। ঋষিদের আশীর্বাদে রাজার কোনো ক্ষতি হলো না। তিনি সুস্থই রইলেন। এদিকে রাজপুত্র জন্মেছে— সে যেভাবেই জন্মাক, সংবাদ পেয়ে সকলেই খুশি হলো। রাজ্যে খবর চলে গেল। রাজ্যময় প্রজারা আনন্দে মেতে উঠল।

এদিকে শিশু জন্মেই শুরু করল পরিত্রাহী চিৎকার। খিদের টানে বার বার মুখে আঙুল পুরে চুষতে লাগল। শিশু মানেই তো সে মায়ের বুকের দুধ খাবে। সকলেই পড়লেন মহা সমস্যায়।

ঋষিরা দেবরাজ ইন্দ্রকে আহ্বান করলেন। ইন্দ্র উপস্থিত না হয়ে পারলেন না। অসহায় শিশুর কান্না তাঁকে বিচলিত করল। ঋষিরা বললেন, দেবরাজ, আপনিই ছিলেন যজ্ঞের মুখ্যদেবতা। আপনিই এই শিশুর বেঁচে থাকবার ব্যবস্থা করে দিন। এর তো কোনো মা নেই।

দেবরাজ তখন সেই ব্যবস্থাই করলেন। বললেন,— আপনারা চিন্তা করবেন না। আমিই ওর দায়িত্ব নিচ্ছি--- মাং ধাতা--- আমাকে ধারণ করেই এই শিশু বড়ো হয়ে উঠবে।

এই বলে ইন্দ্র তাঁহর হাতের একটি আঙুল শিশুর মুখে দিলেন। আর অমনি সেই আঙুল থেকে অমৃতধারার মতো দুধ ঝরে শিশুর ক্ষুধা মেটাল। কান্না বন্ধ হলো। কেবল তাই নয়, ইন্দ্রের আশীর্বাদে দেখতে দেখতে শিশু পূর্ণবয়স্ক যুবকে পরিণত হয়ে গেল। ইন্দ্র তখন বললেন— আমাকে ধারণ করে ও বড়ো হয়েছে— এই যুবকের নাম হলো মান্ধাতা।

সেই থেকে যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা নামেই পরিচিত হলো। কালক্রমে সে সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর হয়েছিল।

আমরা প্রাচীন কিছুর প্রসঙ্গ এলেই বলি— মান্ধাতার আমলের ব্যাপার— এই মান্ধাতা থেকেই এসেছে সেই কথাটি।

## ভালো কথা

# হরিদ্বার ভ্রমণ

অনেক দিন থেকেই ইচ্ছা ছিল পাহাড়ে যাওয়ার। আগের বছর দার্জিলিঙে গিয়ে যেই একবার পাহাড়ের স্বাদ পেয়েছি, এখন বার বার যেতে ইচ্ছা করে। শেষমেষ আমরা এলাম হরিদ্বারে। এখানে ছিলাম তিন দিন। প্রথমদিন গেলাম কনখল। ওখানে দেখলাম দক্ষ-কুণ্ড এবং সতী-কুণ্ড। তারপর গেলাম হরিদ্বারের জাগ্রত মনসা মন্দির ও চণ্ডী মন্দির। প্রথমে রোপওয়েতে করে মনসা মন্দির দর্শন করলাম, তারপর চণ্ডী মন্দির দর্শন করে ফিরে এলাম। রোপওয়েতে একদিকে যেমন ভয় লাগছিল অন্যদিকে সেরকম মজাও হচ্ছিল। দ্বিতীয় দিনে গেলাম হৃষিকেশ। ওখানে গঙ্গা নদী দেখলাম। তারপর রাম ঝুলাতে করে নদীর এপার থেকে ওপারে গেলাম। লক্ষ্মণ ঝুলায় যেতে পারিনি কারণ ওখানে কাজ চলছিল। হৃষিকেশে স্বর্গ আশ্রম দেখলাম। সেদিন বিকেলে গঙ্গা আরতি দেখলাম। এই দুই জায়গারই গঙ্গার জল খুব পরিষ্কার। তৃতীয় দিনে গেলাম মুসৌরি। আমরা প্রথমে দেখলাম সহস্রধারা, দ্রোণাচার্যের মন্দির ও গুহা।

**আরাত্রিকা মিশ্র,** অষ্টমশ্রেণী, তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর।

## যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে
SIP করুন
(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

★ RETIREMENT PLANNING.
★ CHILDREN EDUCATION FUND.
★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
★ WEALTH CREATION.
★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT
8240685206
9748978406
Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com
PMS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond
ডোমজুড় বিসনস প্লাজা (পোষ্ট অফিসের নিকেটে), ৩য় তল, ডোমজুড়, হাওড়া।
মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

# পশ্চিমবঙ্গে নারী নির্যাতনের ধারাবাহিকতা

**দেবযানী ভট্টাচার্য**

পশ্চিমবঙ্গে নারী নির্যাতন নিয়ে লিখতে গেলে ধন্দে পড়তে হয়। এ রাজ্য নির্দিষ্ট অর্থে নারী নির্যাতনের রাজ্য হয়ে উঠল কবে থেকে? শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানি গল্পের একটি অংশের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক—''যে যুগের কথা বলিতেছি, তাহা আজ হইতে চারি শতাব্দীরও অধিককাল হইল অতীত হইয়াছে। সম্ভবতঃ আমাদের ঊর্ধ্বতন পঞ্চদশ পুরুষ সে সময় জীবিত ছিলেন। তখন বাংলার ঘোর দুর্দিন যাইতেছিল। রাজশক্তি পাঠানের হাতে; ধর্ম ও সমাজের বন্ধন বহু যুগের অবহেলায় গলিত রজ্জু-বন্ধনের ন্যায় খসিয়া পড়িতেছে। দেশও যেমন অরাজক, সমাজও তেমনি বহুরাজক। কেহ কাহারও শাসন মানে না। মৃত বৌদ্ধধর্মের শবনির্গলিত তন্ত্রবাদের সহিত শাক্ত ও শৈব মতবাদ মিশ্রিত হইয়া যে বীভৎস বামাচার উত্থিত হইয়াছে তাহাই আকণ্ঠ পান করিয়া বাঙ্গালি অন্ধ-মত্ততায় অধঃপথের পানে স্খলিতপদে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সহজিয়া সাধনার নামে যে উচ্ছৃঙ্খল অজাচার চলিয়াছে, তাহার কোনও নিষেধ নাই। কে কাহাকে নিষেধ করিবে? যাহারা শক্তিমান, তাহারাই উচ্ছৃঙ্খলতায় অগ্রবর্তী। মাতৃকাসাধন, পঞ্চ'ম'কার উদ্দাম নৃত্যে আসর দখল করিয়া আছে। প্রকৃত মনুষ্যত্বের চর্চা দেশ হইতে যেন উঠিয়া গিয়াছে। তখনও স্মার্ত রঘুনন্দন আচারকে ধর্মের নিগূঢ় বন্ধনে বাঁধিয়া সমাজের শোধন- সংস্কার আরম্ভ করেন নাই। কাণভট্ট রঘুনাথ (রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী) মিথিলা জয় করিয়া ফিরিয়াছেন বটে, কিন্তু নবদ্বীপে সরস্বতীর পীঠ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। নদের নিমাই তখনও ব্যাকরণের টোলে ছাত্র পড়াইতেছেন ও নানাপ্রকার ছেলেমানুষি করিতেছেন। তখনও সেই হরিচরণস্রুত প্রেমের বন্যা আসে নাই বাঙালীর ক্লেদকলুষিত চিত্তের বহু শতাব্দী সঞ্চিত মলামাটি সেই পূত প্রবাহে ধৌত হইয়া যায় নাই।" অর্থাৎ এই সেই সময় যখনও নিমাই পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হয়ে ওঠেননি এবং উপরোক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তখনও বঙ্গদেশের সামাজিক পরিস্থিতি আজকের পরিস্থিতির মতই ছিল এবং চলছিল নারী নির্যাতন, তাও ধর্মের নামে। অতঃপর সমাজের সেই ক্লেদ পরিস্কৃত হয়েছিল, নিমাই পণ্ডিত ধারণ করেছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর রূপ এবং মাতৃকাসাধনার নামে বামাচার, অজাচার ও অনাচারের হাত থেকে মুক্ত হয়েছিল বঙ্গদেশ।

এমনভাবে কাটল দুই শতাব্দীকাল। অতঃপর নবাব সিরাজউদ্দৌলার আমলে বাংলার নারীদের কপালে আবার ঘনিয়ে এল দুর্যোগ। লম্পট নবাব তার লাম্পট্যে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করছিলেন বঙ্গদেশের মেয়েদের। শুরু হয়ে গিয়েছিল বেছে বেছে হিন্দু নারীদের উপর অত্যাচার। এমনই এক সময়ে সিরাজউদ্দৌলার নজর পড়েছিল রাণী ভবানীর কন্যা তারাসুন্দরীর উপর। অতঃপর রাণী ভবানী বঙ্গদেশের অন্যান্য রাজা ও সমৃদ্ধশালী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যুক্তি করে লম্পট নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করেন রবার্ট ক্লাইভের সাহায্য নিয়ে, ফলে পতন ঘটে লম্পট, অবাঙ্গালি মুসলমান শাসকের।

এর পর অর্ধশতাব্দী কাটতে না কাটতেই বেঙ্গল প্রভিন্সে এসে হাজির হয় ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা এবং তাঁদের বর্ণনা থেকেই জানতে পারা যায় যে তৎকালীন বাংলার ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ সতীদাহ প্রথার নামে জীবন্ত পুড়িয়ে মারছিল কুলীন ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা নারীদের। যদিও এই তত্ত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে সতীদাহ কোনো বাধ্যতামূলক 'প্রথা' আদৌ ছিল না এবং যেরকম শোনা যায় সেরকম বাছবিচারহীন ভাবে ব্রাহ্মণ পরিবারের সকল বিধবাদেরই যে পুড়িয়ে মারা হত তাও মোটেই নয় বরং ব্যাপটিস্ট মিশনারিরাই হিন্দু সমাজের এক অংশের সঙ্গে বোঝাপড়া করে এমন বেশ কিছু সতীদাহের ঘটনা ঘটিয়েছিলেন যাতে করে সেই ঘটনাগুলিকে ইউরোপীয় দুনিয়ায় এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে এদেশের মানুষকে অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রতিপন্ন করে সে হেন কুসংস্কারের হাত থেকে মুক্ত করে তাদেরকে সভ্য করার অজুহাতে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট থেকে ভারতবর্ষে ক্রিশ্চানিটি প্রচারের স্পষ্ট ছাড়পত্র পাওয়া যায়। সে যাই হোক, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই হোক আর ধর্মীয় গোঁড়ামির উৎকট প্রদর্শনের স্বার্থেই হোক এ হেন সতীদাহের নামে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও বাংলায় যে নিশ্চিতভাবেই চলেছিল নারীনির্যাতন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। এবং এহেন নারী নির্যাতনের হাত থেকে সমাজের মুক্তির পথিকৃৎ হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায় এবং বাঙ্গলায় শুরু করিয়ে দিয়েছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের যুগ, যার পর থেকে ধর্মীয় গোঁড়ামির নামে নারী নির্যাতনের ট্রেণ্ডটি নিম্নমুখী হয় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাতে পালন করেন তাঁর নিজস্ব তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা। নারী নির্যাতনের প্রতিকারার্থে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর উভয়েই শোধন করেছিলেন হিন্দু সমাজে বেনোজলের মত ঢুকে আসা সেইসব কদাচারকে যেগুলি রিলিজিয়নের পরিসরে আদৌ স্থান পেয়েছিল কিছু মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য কিন্তু সেসব কদাচারের প্রতিষ্ঠা কায়েমী স্বার্থবাদী মানুষগুলি করেছিলেন ধর্মের নামে। রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উভয়েই এই সকল কদাচারের শোধন করেছিলেন সনাতন ধর্ম থেকে বেরিয়ে গিয়ে নয়, বরং সনাতন ধর্মের পরিসরের ভিতর থেকে সনাতন ধর্মশাস্ত্রগুলির সহায়তা নিয়েই। তৎকালীন হিন্দুকে তাঁরা ফেরাতে চেয়েছিলেন সনাতন

ধর্মের বৈদিক মূল তত্ত্ব এবং অন্যান্য প্রাচীন টেক্সটগুলির দিকে। এর মাধ্যমে যেমন ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের পাকা ধানে মই দেওয়া হয়েছিল তেমনই আবার পা দেওয়া হয়েছিল ধর্মীয় গোঁড়ামির নামে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চাওয়া হিন্দুদের লেজেও।

ঠিক এই সময়েই বঙ্গের বুকে আবির্ভাব হয় যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের। শক্তির সাধনা ও মাতৃপূজাকে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর বামাচারের ক্লেদমুক্ত করে বাংলার সাধারণ নারীকে যিনি মুক্ত করতে চেয়েছিলেন সমস্ত প্রকার নির্যাতনের পরিসর থেকে এবং সেই উদ্দেশ্যে তাঁদের উত্তরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন সাধারণ নারী থেকে মাতৃশক্তিতে। মাতৃশক্তির জাগরণধর্মী এহেন সমাজসংস্কার কার্যে শ্রীরামকৃষ্ণের সুযোগ্য সহধর্মিণী তথা কমরেড ('কমরেড' শব্দের ব্যবহার এক্ষেত্রে সচেতন প্রয়োগ) হন শ্রীশ্রী মা সারদা, ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের পটভূমিকায় সমাজ গঠনে মাতৃধর্ম পালনের কার্যকারিতা সম্বন্ধে সাধারণ সমাজকে যিনি নতুন করে অবহিত ও সচেতন করেন।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে নারী নির্যাতনের নিরিখে বঙ্গদেশে দৃশ্যমান হয়েছে 'পতনঅভ্যুদয়বন্ধুরপন্থা"। নানা অজুহাতে বঙ্গদেশে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে নানা সময়ে বারংবার, অত্যাচার উঠেছে চরমে, আর সে হেন চরম বৃদ্ধির ঠিক পরেই বাঙ্গলার মাটি থেকেই উঠে এসেছে সে নির্যাতনের প্রতিকার। কখনও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের রূপে, কখনও বা রাজা রামমোহন বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আবার কখনও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের রূপে। এ রাজ্যের মাটিতে এঁদের প্রত্যেকেরই আবির্ভাব হয়েছিল নারী নির্যাতনের প্রতিকারস্বরূপ। অর্থাৎ বাঙ্গলায় নারী নির্যাতন থেকে মুক্তির পথ খুঁজে বের করেছে বাঙ্গলাই। ''পতনঅভ্যুদয়- বন্ধুরপন্থা"!

এবার বরং তাকানো যাক বিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ শাসনাধীন বেঙ্গল প্রভিন্সের দিকে। স্বাধীনতার পূর্বে বঙ্গপ্রদেশ যখন অবিভক্ত ছিল, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তখনও এ রাজ্যে কম হয়নি। সেসবের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নারী, পুরুষ, শিশু, গবাদিপশু, শস্যক্ষেত্র ও বসবাসের অন্যান্য নানা সম্পত্তিসহ গোটা সমাজ ও প্রকৃতি। কিন্তু এসবের কোনো পৃথক প্রভাব বঙ্গের নারীদের উপর বুঝি বা পড়েনি। কিন্তু ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এর সময় কলকাতার অমুসলিম রমণীদের পৃথকভাবে টার্গেট করার একখানি রণনীতি নেওয়া হয়েছিল মুসলিম লিগের অসংগঠিত সৈন্যদের দিক থেকে। মেয়েদের নগ্ন দেহ তারা ঝুলিয়ে রেখেছিল রাজাবাজারের গোমাংস বিক্রয়ের আউটলেটগুলিতে, ঝুলিয়ে রেখেছিল ভিক্টোরিয়া কলেজের হোস্টেলের জানালাতেও। অর্থাৎ দাপটের সঙ্গে নারী নির্যাতনের এহেন প্রদর্শনী এ রাজ্যে হয়েছিল সেই বুঝি প্রথমবার।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমনের পূর্বে বামাচারের স্বার্থে কিংবা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সতীদাহের নামে নারী নির্যাতনের মধ্য থেকে পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হত সামগ্রিক সমাজের পাপবোধ ও কুণ্ঠা। অনাচারের বিরুদ্ধে সামগ্রিক সমাজ সাধারণভাবে নীরব থাকলেও সমাজের ভাবভঙ্গিমায় প্রকাশিত হত পাপবোধ। কিন্তু মুসলিম লিগের হাতে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে নির্যাতনকারীদের মধ্যে বুঝি বা ছিল না বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠা, বরং সে হেন নির্যাতনকে তারা দিয়েছিল বীরত্বের রূপ। তারা বুঝেছিল যে অন্তরমনে পাপবোধ ও কুণ্ঠা নিয়ে পাপাচার করলে সে পাপাচারের বিনাশের বীজ লুকিয়ে থাকে পাপাচারীর নিজ অন্তরেই। কিন্তু পাপকে বীরত্বের রূপ দান করলে পাপাচারের ব্যাপকতা বৃদ্ধি করার পথ প্রশস্ত ও সুগম হয়। মুসলিম লিগ তাই বুঝিয়ে দিয়েছিল যে 'ডায়রেক্ট অ্যাকশন'-এর ক্ষেত্রে নারী ও শিশুদের রেহাই দেওয়ার ভারতীয় পদ্ধতি তারা মানবে না। একইভাবে নোয়াখালী গণহত্যায় এবং পূর্ববঙ্গের নানা স্থানেও অনুরূপ যৌন আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের নারীরা।

অতঃপর স্বাধীনতার সময় বঙ্গদেশের বিভাজনের ফলে স্বাধীনতাউত্তরকালে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একখানি (হিন্দু হোমল্যান্ড) অঙ্গরাজ্য হিসেবে রয়ে যাওয়ায় মুসলিম লিগের ধাঁচে নারী নির্যাতনের হাত থেকে সাময়িকভাবে কিঞ্চিৎ মুক্তি লাভ করেছিল পশ্চিমবঙ্গের নারীরা। কিন্তু পূর্ববঙ্গের নারীরা সে মুক্তি পায়নি আজ পর্যন্ত কখনওই কারণ স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গ পরিণত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে সেখানে মুসলিম লীগের ধাঁচে নারী নির্যাতন চলতে থাকে অনবরত, আজও পর্যন্ত। সাম্প্রতিক অতীতে নারী নির্যাতন বুঝি বা চরমে উঠেছে সেখানে। তবে কি বাংলার চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে আবার আসন্ন নারী নির্যাতন থেকে মুক্তির পথ?

ফেরা যাক পশ্চিমবঙ্গের কথায়। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তাল থেকেছে উদ্বাস্তু সমস্যা ও খাদ্যসংকট নিয়ে। রাজ্যের মানুষ তখন ভাতের বদলে বাধ্য হয়ে রুটি খেতে শিখছে এবং তাই নিয়ে জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে লোক ক্ষেপানোর রাজনীতি চরছে কমিউনিস্ট পার্টি এবং সেই সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে কংগ্রেসকে ভিতর থেকে ভাঙ্গবার প্রয়াসও। ১৯৬০ 'এর দশকের মাঝামাঝি এসে সফল হয় কমিউনিস্ট পার্টির সেই প্রয়াস। কংগ্রেস ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের একদল লোক, তৈরি করে 'বাংলা কংগ্রেস' আর কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙ্গে তৈরি হয় কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সিস্ট এবং সেইসঙ্গে উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি থেকে শুরু হয়ে যায় নকশালবাড়ি আন্দোলন। এই সময়টির কথা না বললে পশ্চিমবঙ্গে নারী নির্যাতনের ধারাবাহিকতার ইতিহাসের সারসংক্ষেপ করার এই প্রয়াস সম্পূর্ণ হবে না।

দলগত রাজনীতির পাশাপাশি ষাটের দশকের গোড়ার দিকে পশ্চিমবঙ্গের জাতীয়তাবাদী মানুষ আরও একবার জোট বেঁধেছিল বিভাজনোত্তর ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে রাজ্যটিকে সুস্থিতি দেওয়ার জন্য এবং স্বাধীনতার প্রকৃত শক্তিতে রাজ্যের সমস্ত মানুষকে শক্তিমান করার লক্ষ্য নিয়ে। এমন সময়, ১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের খুলনায় এক বিধ্বংসী হিন্দুঘাতী রায়টের পরিপ্রেক্ষিতে শহর কলকাতার জাতীয়তাবাদী

মানুষেরা বেছে নেন কলকাতার সংখ্যালঘু মানুষদের উপর এক প্রত্যাঘাতের পথ, আর তা দেখে প্রমাদ গুণে কলকাতা থেকে শুরু হওয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনটিকে হাইজ্যাক করে উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়িতে নিয়ে চলে যায় কমিউনিস্ট পার্টি। নকশালবাড়ি থেকে শুরু হয়েছিল যে আন্দোলন, শুরুতে তাতে যোগদান করেছিলেন বহু জাতীয়তাবাদী মানুষ এবং দিয়েছিলেন আত্মবলিদান। কিন্তু মানুষের জাতীয়তাবাদী আবেগকে কাজে লাগিয়ে কমিউনিস্ট নেতৃত্ব এ আন্দোলনকে বানিয়ে ফেলেছিল ভয়াবহ এক মারামারি কাটাকাটির আন্দোলন। মানুষ ভেবেছিলেন এ আন্দোলনে তাঁরা প্রত্যেকেই হবেন তাঁদের নিজের দেশ ও রাজ্যের মুক্তিযজ্ঞের ঋত্বিক আর তাতে আহুতি দিয়েছিলেন নিজেদের মেধা, ভবিষ্যতের স্বপ্ন, এমনকি প্রাণ পর্যন্ত। কিন্তু সুযোগসন্ধানী, ধূর্ত ও বিদেশের চরবৃত্তি করা কমিউনিস্ট নেতৃত্ব এ আন্দোলনকে কৌশলগত ও সুপরিকল্পিতভাবে করে তুলেছিল বিপথগামী। নকশালবাড়ি আন্দোলনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের বহু নারীকে হতে হয়েছিল স্বামীহারা আর বহু শিশু হারিয়েছিল বাবা এবং মাকেও কারণ 'পিপলস্ মার্চ' এর নামে বাছবিচারহীনভাবে মারামারি কাটাকাটি ও মানুষের সম্পত্তি দখলের খেলা শুরু করেছিল আন্দোলনের মধ্যে সিঁধ কেটে ঢুকে পড়া কায়েমী স্বার্থবাদী হাইজ্যাকিং ফোর্স। ১৯৭০ 'এর ডিসেম্বর মাসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন কার্যবাহী উপাচার্য কিংবদন্তি প্রফেসর গোপাল চন্দ্র সেনকে যখন পিছন থেকে ছোরা মেরে হত্যা করেছিল তাঁরই এক ছাত্র রানা বসু, নকশাল আন্দোলন তার আগেই হাইজ্যাকড্ হয়ে গিয়েছে কায়েমী স্বার্থবাদী বিদেশি শক্তির চরবৃত্তি করা ছদ্মবিপ্লবীদের দ্বারা। আন্দোলনের নামে এদের হাতেই ভাঙ্গা পড়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি, সেই একই ১৯৭০ সালে। আন্দোলন দমনে যখন এসেছিল রাজ্যের পুলিশ ফোর্স, অরাজক আন্দোলনকারীদের দিক থেকে তখন গুলি চালানো হয়েছিল সেই পুলিশ ফোর্সের উপরেও এবং তারপর পুলিশও করেনি আর কোনো রাখঢাক। নির্বিচারে হত্যা করেছিল আন্দোলনকারীদের যাদের এক বিরাট অংশ নিজেদের ভাবজগতে আদতে ছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী কিন্তু ভেবেছিলেন কমিউনিজমের মধ্য দিয়েই বুঝি দেশকে তাঁরা গড়ে তুলতে পারবেন। সেইভাবে যেভাবে তাঁরা চিরকাল দেখতে চেয়েছিলেন নিজের দেশকে। (কারণ স্বাধীনতা পরবর্তী প্রায় দেড় দশক কেটে যাওয়ার পরও তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে বিদেশি শক্তির খপ্পর থেকে ভারত যেন তখনও মুক্ত নয়। কমিউনিজমের প্রকৃত স্বরূপ তাঁরা তখনও অনুধাবন করতে পারেন নি। কমিউনিস্ট নেতৃত্বের এক অংশই যে নিযুক্ত ছিল বিদেশী শক্তির চরবৃত্তিতে, কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগদান করা অন্তর্নিহিতভাবে জাতীয়তাবাদী অসংখ্য আন্দোলনকারী তা সেদিনও অনুভব করতে পারেন নি, বা তাঁদের মধ্যে যাঁরা জীবিত আছেন এখনও তাঁরা তা অনুভব করতে পারেন নি আজও। তাই হয়ত বা নিজেদের অজান্তেই নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মগুলিকেও তাঁরা খাইয়ে চলেছেন সেই একই কমিউনিজমের আফিম।)

পুলিশের অত্যাচার এ সময় সহ্য করেছিল শুধু পুরুষ নয়, নারীও এবং পুলিশ কিন্তু নকশালবাদী নারীদের উপর চালিয়েছিল অকথ্য যৌন নির্যাতনও। অর্থাৎ নারী নির্যাতন হয়েছে এ রাজ্যের পুলিশ ফোর্সের দ্বারাও। স্বাধীন দেশের পুলিশ ফোর্স নিজের দেশের মহিলাদের উপর নির্যাতন চালিয়েছিল সেইভাবে যেভাবে এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী মহিলাদের উপর অত্যাচার চালিয়েছিল ব্রিটিশ পুলিশ অথবা যেভাবে পাকিস্তানের জেলে মুসলিম পুলিশ বাহিনীর হাতে অত্যাচারিত হয়েছিলেন (তেভাগা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেত্রী) ইলা মিত্রের মত ভারতীয় নারীরা। ১৯৭০-এর দশকে যে পুলিশ বাহিনী নেমেছিল নকশাল আন্দোলন দমনে, চাকরিজীবনের গোড়ার দিকে সেই পুলিশ অফিসাররা প্রশিক্ষিত হয়েছিল ব্রিটিশ পুলিশের হাতে আর সে শিক্ষাই বুঝি বা নকশাল আন্দোলনকারী মহিলাদের উপরেও প্রয়োগ করেছিল তারা। অর্থাৎ ভবিষ্যতে যদি পশ্চিমবঙ্গের মাথার উপর ঘনিয়ে আসে অন্য কোনো গণআন্দোলন বা গৃহযুদ্ধের মেঘ, তখনও এ রাজ্যের পুলিশ হয়ত বা এ রাজ্যেরই মেয়েদের উপর প্রয়োগ করবে যৌন নির্যাতনের সেই পুরোনো অস্ত্র যে অস্ত্র এ দেশের মেয়েদের উপর একদা প্রয়োগ করেছিল আব্রাহামিক মতাবলম্বী ব্রিটিশ এবং পাকিস্তানিরা কারণ এ রাজ্যের পুলিশের মধ্যে ইতিমধ্যেই ঢুকে পড়েছে আব্রাহামিক মতাবলম্বী বহু মানুষ, যুদ্ধক্ষেত্রে মহিলাদের যারা আক্রমণ করে থাকে যৌনতাকে হাতিয়ার করে।

মহাবিপ্লবের মাধ্যমে প্রকৃত সাম্য ও স্বাধীনতা আনবার এবং দেশকে পাল্টে দেওয়ার সুখস্বপ্নের জাল বুনে নকশালবাদী বহু বিপ্লবীই এই সময়ে রাজ্যের নানা স্থানে কিশোরী, তরুণী, যুবতী মহিলাদের সাথে গড়ে তুলেছিল প্রেমের সম্পর্ক। রূপকথার গল্পের মত করে বিপ্লবের গল্প এবং 'বিশ্বজোড়া যৌথ খামার' এর কল্পনামেদুর বর্ণনা শুনে বহু মেয়েও পাগল হয়েছিল তাদের প্রেমে। কিন্তু আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর অনিমেষ-মাধবীলতারা যেমন সমস্ত জীবন ধরে করেছিল তার দীর্ঘ প্রায়শ্চিত্ত, অতীন মজুমদারের মত সুযোগসন্ধানী বিপ্লবীদের অনেকেই তেমনি বিপদ দেখে পালিয়ে গিয়েছিল ভিন রাজ্যে বা ভিন দেশে এবং এ রাজ্যে তাদের প্রেমিকাদের অতঃপর কি হয়েছিল সে খোঁজ আর রাখেনি। মনে করা যাক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসের একটি অংশ। ''...ওই দিনই ময়দানের অন্য প্রান্তে আর এক বিশাল সভায় জ্যোতি বসু বললেন, তাঁর সরকার একদিনে নকশালদের দমন করতে পারে কিন্তু তিনি জনসাধারণের হাতেই সে ভার ছেড়ে দিতে চান। নকশালদের রাজনৈতিক বক্তব্য মোকাবিলা করা হবে রাজনৈতিক ভাবে, কিন্তু তাদের খুনজখমের ক্রিয়াকর্মগুলো সাধারণ অপরাধীদের মতন বিচার করা হবে আইনের চোখে।

তার পরদিনই অতীন জাহাজে ভেসে পড়ল।....'' এমনই ছিল নকশাল আন্দোলনের সময়কার বহু সুযোগসন্ধানী

বিপ্লবীর প্রকৃত স্বরূপ আর এমনই ছিল জ্যোতি বসুর মত অ-নকশালবাদী কমিউনিস্ট নেতার সঙ্গে তাদের বোঝাপড়ার প্রকৃত চিত্র। ময়দানের মিটিং-এ এ হেন ঘোষণার মাধ্যমে জ্যোতি বসু আদতে নকশালবাদী বিপ্লবীদের দিয়েছিলেন পালানোর সুযোগ। ইঙ্গিতে বুঝিয়েছিলেন যে যারা পালাতে চাইছে, এই সুযোগ! অতীন মজুমদাররা পালিয়ে গিয়েছিল আর অনিমেষ— মাধবীলতারা গুনেছিল ভুলের মাশুল।

১৯৬০ 'এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত কালখণ্ডটিকে নারী পুরুষ নির্বিশেষে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত মানুষ তাই ভুগেছে এক অজানা আশঙ্কায় ও নিরাপত্তাহীনতা। নারী নির্যাতনের নিরিখে এ সময় তাই পৃথকভাবে উল্লেখ্য কোনো সময়কাল না হলেও নকশাল আন্দোলনের মত একটি পথভ্রষ্ট আন্দোলনের মূল্য চোকাতে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নারীদেরকেও। মা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে, প্রেমিকা হিসেবে, কন্যা হিসেবে এবং পরবর্তী প্রজন্ম হিসেবে। নকশাল আমলে মহিলাদের উপর পুলিশি নির্যাতন ব্যতীত নারীর উপর যৌন নির্যাতনের ঘটনা স্বাধীনতা উত্তরকালে পশ্চিমবঙ্গ বহু বৎসর পর্যন্ত সেভাবে দেখেনি যদিও পূর্ববঙ্গ সে জাতীয় নির্যাতন সহ্য করে এসেছে বারবার, এমনকি আজ পর্যন্ত।

অতঃপর শেষ হতে চলল বাঙ্গালির ভাগ্যকে তছনছ করা উত্তাল ১৯৭০-এর দশক এবং দশকের শেষ বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সাক্ষী থাকল মরিচঝাঁপি গণহত্যার। এ সময়েও রেহাই দেওয়া হয় নি নারী ও শিশুদের, কিন্তু সে হত্যাকাণ্ডের সময় নারীদের উপর যৌন নির্যাতন হয়েছে বলে জানা যায় না। বরং যৌন নির্যাতনের যে ঘটনাটি পশ্চিমবঙ্গের আত্মাকে আজও কাঁপিয়ে দেয় সেটি হল ১৯৯০ সালের বানতলার ঘটনাটি। মৃত অনিতা দেওয়ানের যোনিপথে পাওয়া গিয়েছিল আস্ত একখানি টর্চ আর ফরেনসিক এক্সপার্ট লেডি ডক্টর তা দেখে সংজ্ঞা হারিয়েছিলেন ময়নাতদন্তের টেবিলেই। পশ্চিমবঙ্গের চেয়ারে তখন জ্যোতি বসু। অথচ আজ যখন অভয়ার ময়নাতদন্ত হল আর জি কর হাসপাতালে এবং তাতে উপস্থিত থাকলেন নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ থেকে আসা লেডি ফরেনসিক এক্সপার্ট (যাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিবিআই'ও), তখন অভয়ার ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখে তাঁর মনও কি বিচলিত হয়েছিল একইভাবে? রাজ্যের মানুষ এ প্রশ্নের উত্তর এখনও জানে না। বানতলা থেকে আরজি কর—নারী নির্যাতনের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশঃই গড়িয়ে নেমেছে অপরিমেয় অধঃপাতের অতল খাদে।

অতঃপর ১৯৯০-এর দশকের মধ্য ভাগে জ্যোতি বসুর শাসনকালের শেষ কয়েক বছরে উত্তর চব্বিশ পরগণার বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলগুলি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সমাজেও পা রাখে নারী নির্যাতনের দানব। জ্যোতি বসুর জমানায় উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বাংলাদেশ সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে সিপিএমের পতাকার ছত্রছায়ায় দাঁড়িয়ে মজিদ মাস্টার, ঈশা লস্করের মত 'তৎকালীন শেখ শাহজাহান'দের অত্যাচারের কথা রাজ্যের মানুষ আজও ভোলে নি। অতঃপর ১৯৯৭ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মের পর থেকে এ অঞ্চলে দাপিয়ে বেড়াতে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেসের জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। সেই শুরু। তারপর ২০০৩ সালে এ রাজ্যের ধানতলায় ঘটে যায় ডাকাতি ও ধর্ষনের সেই কুখ্যাত ঘটনাটি এবং উত্তর চব্বিশ পরগনার সীমান্তবর্তী অঞ্চল জুড়ে ঘটতে থাকে নারীদের সম্ভ্রমহানির আরও অজস্র ঘটনা যেগুলির রেফারেন্স সংবাদমাধ্যমের কাছে আছে। এই সম্পূর্ণ কালখণ্ডটিতে গাইঘাটার বিধায়ক ছিলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক।

বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালেই পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশের ২২১৬.১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রায়োন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে চালু হয়ে গিয়েছিল নানা ধরনের অপরাধমূলক পাচারব্যবসা যার মধ্যে অন্যতম ছিল নারী ও শিশুপাচার। নারীপাচারে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মধ্যে অন্যতম শীর্ষ স্থানাধিকারী রাজ্য হিসেবে থেকেছে বামফ্রন্ট সরকারের আমল থেকেই। যে রাজ্যের প্রশাসন রাজ্যের মেয়েদের পণ্যায়নের মত জঘন্য অপরাধের প্রতিকার করতে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয় না বরং সে হেন অপরাধে নীরবে জোগায় মদত, সেই প্রশাসনকে নারীবিদ্বেষী, নারীবিরোধী ও পরোক্ষে নারী নির্যাতনকারী বললে আদৌ ভুল হয় কি? অর্থাৎ স্বাধীনতা পরবর্তী উত্তরাধুনিককালে নারী নির্যাতনের সংস্কৃতিটি এ রাজ্যে মার্ক্সবাদীদের দান বললেও ভুল বলা হয় না। অবশ্য মার্ক্সবাদ একখানি ইউরোপীয় মতবাদ হওয়ার কারণে আব্রাহামিক মতবাদগুলির প্রতিই যে মার্ক্সীয়দের আনুগত্য থাকবে, সনাতন ভারতীয় ভাবধারার প্রতি থাকবে না, তা আশ্চর্যের নয়, অপ্রত্যাশিতও নয়। ভারতবর্ষের মত দেশে নারী নির্যাতনের মত অপরাধ শুরু হওয়ার পিছনে মূল চালিকাশক্তি যে বৈদেশিক আব্রাহামিক মতবাদগুলিই, নানা ঘটনাপ্রবাহের সময়ানুক্রম সেই দিকেই নির্দেশ করে।

২০১১ পরবর্তী সময়ে অবশ্য এ হেন ঘটনাগুলির বৃদ্ধির হার প্রায় আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছে। ২০১১'য় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী এবং জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক হাবড়ার বিধায়ক হওয়ার পর ২০১২ সালেই হত্যা করা হয় সুঁটিয়া গাইঘাটার শিক্ষক বরুণ বিশ্বাসকে যিনি ঐ অঞ্চলে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের ভয়াবহ অপসংস্কৃতিটির বিরুদ্ধে মাটির উপর দাঁড়িয়ে চালিয়ে যাচ্ছিলেন এক সঙ্ঘবদ্ধ লড়াই। এমনকি ধর্ষকদের মন পরিবর্তনের জন্যও কাজ করে যাচ্ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস। প্রমাদ গুনেছিল নারী নির্যাতন সংস্কৃতির তল্পিবাহকরা। বরুণ বিশ্বাসের হত্যার ঠিক পরের বছরেই কামদুনিতে নারী নির্যাতনের এক বীভৎস দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নারী নির্যাতনকারীরা বার্তা দিয়েছিল যে রাজ্যে তাদের যে দাপট শুরু হয়েছিল ১৯৯০ 'এর দশকের মধ্যভাগ থেকে, তা বজায় থাকবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময়েও। কামদুনির গণধর্ষণের ঘটনাটিই পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্ধকারময় শাসনকালের প্রারম্ভের নির্দেশক।

বামফ্রন্টের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ রাজ্যে এসেছিলেন এক অতিবামপন্থী নেত্রী হিসেবে। পশ্চিমবঙ্গের নারীদের জন্য তাঁর আগমন আদতে ছিল এক অভিশাপ যদিও

আপাতদৃষ্টিতে মহিলাদের কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন জনপ্রিয় এক জননেত্রী। কিন্তু এতদসত্ত্বেও, তথ্যগতভাবে দেখলে দেখা যাবে যে স্বাধীনতা পরবর্তী উত্তরাধুনিক কালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলেই পশ্চিমবঙ্গে নারী নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে সর্বাধিক হারে, বৃদ্ধি পেয়েছে উত্তরোত্তর আর ২০১৩ সাল থেকেই সন্দেশখালিতে শুরু হয়ে গিয়েছে পদ্ধতিগত নারী নির্যাতন যার মাধ্যমে আদতে আদায় করা হয়েছে মহিলাদের তথা তাঁদের গোটা পরিবারের রাজনৈতিক আনুগত্য। মহিলাদের যৌন-নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু করে তোলার অপ-সংস্কৃতি চালু হয়েছিল কেবল উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার সন্দেশখালির প্রত্যন্ত প্রান্তেই নয়, বরং রাজ্যের নানা স্থানে ছড়িয়ে থাকা মেডিকেল কলেজগুলিতেও। অভয়া হত্যাকাণ্ডের পর অভিযোগ উঠে গিয়েছে যে রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলিতে মহিলা ছাত্রীদের পাশ করানো, ডিগ্রী ও রেজিস্ট্রেশন দেওয়া থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুর জন্যই বহু মেয়েকে নাকি সহ্য করতে হয়েছে যৌন শোষণ। সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজের শীর্ষ ব্যক্তিবর্গ থেকে শুরু করে নিম্নস্তরে শাসকদল ঘনিষ্ঠ পিজিটি, হাউসস্টাফ পর্যন্ত অনেকেই নাকি ছাত্রীদের সঙ্গে এই প্রকার কার্যে লিপ্ত হয়েছেন বলে ভুরি ভুরি অভিযোগ জমা পড়েছে সংবাদমাধ্যমের কাছে। অর্থাৎ গ্রাম্য বা শহুরে, এলিট বা সাবঅল্টার্ন নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের রাজনৈতিক আনুগত্য আদায় করে নেওয়ার জন্য মহিলাদের যৌনতাকে লক্ষ্যবস্তু বানানোর আব্রাহামিক ভাবধারাটিকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের চিন্তাভাবনার মূলস্রোতে আনবার প্রয়াসকে প্রাতিষ্ঠানিকতা দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম। এবং তার দ্বারাই নারী নির্যাতনের উপর নিজস্ব অনুমোদনের শীলমোহর লাগিয়ে দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। অর্থাৎ ''মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু'' এমন একখানি সাধারণ কথ্য প্রবচনকে আরও একবার সত্যি প্রমাণ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০২৪ সালে দাঁড়িয়ে হিসেব করলে দেখা যাবে যে এ রাজ্যের বুকে প্রতি দিন ঘটছে একাধিক নারী নির্যাতনের ঘটান যেগুলি সংবাদমাধ্যমে 'খবর' হচ্ছে। অর্থাৎ এগুলি ছাড়াও নিশ্চিতভাবেই ঘটছে এমন আরও অনেক ঘটনা যেগুলি রিপোর্টেড হচ্ছে না। সেসবের মধ্যে আর জি কর হাসপাতালের ঘটনাটি শহর কলকাতার বুকে এমন এক বিরল ঘটনা যার পর প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে এমনকি শহুরে জনতাও। সন্দেশখালির নজিরবিহীন ঘটনার কথা জানতে পেরেও ভাব বৈকল্য দেখা যায় নি যাদের মধ্যে, আর জি করের ঘটনার পর এমনকি তাদের ক্ষোভও বন্যার মত বেরিয়ে এসেছে রাজপথে। শহুরে ভদ্রলোকেদের বিক্ষোভের এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ-এ রাজ্যের নারী নির্যাতন সংস্কৃতির তল্পিবাহকদের মনে জাগাচ্ছে ভয় এবং যে ভয় বর্তমানে নারী নির্যাতনকারীরা পাচ্ছে সেই ভয়কে সত্যি করে তোলার ক্ষমতা আছে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে আজ পর্যন্ত যে প্রকার নির্যাতনের শিকার হয়ে চলেছেন পূর্ববঙ্গের নারীরা অথবা গত বিশ-ত্রিশ বছর যাবৎ যে প্রকার নির্যাতনের শিকার অহরহ হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের মেয়েরাও, সে নির্যাতন মূলতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হলেও মুসলিম সম্প্রদায়ের মহিলারাও এ থেকে মুক্ত নন। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর, হুগলী, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, উত্তর চব্বিশ পরগনা, বীরভূম ইত্যাদি নানা জেলায় প্রকাশ্যে আসছে মুসলমান পুরুষের হাতে মুসলিম নারীরও বেধড়ক নির্যাতন তথা মৃত্যুর ঘটনা। সম্প্রতি উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান এ ধরনের একটি ঘটনাকে সমর্থন করে বলে ফেলেছিলেন, ''আমাদের মুসলিম দেশে এমনটা হয়েই থাকে''—তাঁর এমন বক্তব্য এক পলকের মধ্যে আমাদের স্মরণে এনে দিয়েছিল প্রাচীন সেই ষোড়শ শতাব্দীর বঙ্গদেশের কথা যখন ধর্মের নামে চলেছিল অজাচার, আর জগাই মাধাইয়ের মত লম্পট, পাপাচারে লিপ্ত মানুষদের হাতে ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতার রাশ। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানি রচনাংশ এক্ষেত্রে স্মর্তব্য—''কেহ কেহ লুকাইয়া পাপাচরণ করে। কিন্তু ধর্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া পাশবিক বলে প্রকাশ্যভাবে পাপানুষ্ঠান করিতে যাহারা অভ্যস্ত, তাহাদের অপরাধক্লান্ত জীবনে এমন অবস্থা আসে, যখন কেবল মাত্র রমণীর সর্বনাশ করিয়া আর তাহারা তৃপ্তি পায় না। তখন তাহারা পাপাচারের সহিত ধর্মের ভণ্ডামি মিশাইয়া তাহাদের দুষ্কার্যের মধ্যে এক প্রকার নূতন রস ও বিলাসিতা সঞ্চারের চেষ্টা করে''। আজকের পশ্চিমবঙ্গে হামিদুর রহমানের মত লোকেদের ক্ষেত্রে এই বর্ণনা প্রযোজ্য। নারী নির্যাতনের উপলক্ষ্য হিসেবে রিলিজিয়নকে ব্যবহার করার সেই ট্রাডিশন আজও চলেছে এবং হামিদুল, তাজেমুল, শাহজাহানরাই এ যুগের জগাই-মাধাই।

বঙ্গভূমিই সেই স্থান যে স্থানে বার বার মহাপুরুষেরা আবির্ভূত হয়েছেন নারী নির্যাতনের প্রতিকারার্থে। তাই জেসিবি ওরফে তাজেমুল হকের মত মানুষদের হাতে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সমস্ত পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গবাসী রমণীদের নির্যাতনের প্রতিকার করতেও যদি এই পুণ্যভূমিতেই আবার জন্ম নেন কোনো মহাপুরুষ তাহলেই বুঝি বা মান রক্ষা হবে বঙ্গভূমির চিরায়ত ঐতিহ্যের।

## শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের কলকাতা মহানগর প্রচারক নরেন্দ্রনাথ বেরার মা বীণাপাণি দেবী গত ৩১ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। তিনি তাঁর ৪ পুত্র, ৪ কন্যা, পুত্রবধূ, জামাতা এবং ১২ জন নাতি-নাতনিদের রেখে গিয়েছেন।

* * *

'সহকার ভারতী'-র উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সভাপতি গোবিন্দচন্দ্র দাসের মা সুষমা দাস গত ২৮ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি তাঁর ৫ পুত্র, ২ কন্যা, পুত্রবধূ, জামাতা এবং নাতি-নাতনিদের রেখে গিয়েছেন।

# অখণ্ড ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী

# নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

**প্রণব দত্ত মজুমদার**

১৯৪১ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন শুরু হয়ে গেছে। সুভাষচন্দ্রকে ইংরেজ সরকার আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে মুক্তি দিয়ে তাঁদের এলগিন রোডের বাড়িতে গৃহবন্দি করে রাখল। ১৯৪১ সালের ১৬ জানুয়ারি গভীর রাতে সুভাষচন্দ্র অসামান্য দক্ষতায় ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেলেন। তিনি মহম্মদ জিয়াউদ্দিন নাম নিয়ে এক ইনস্যুরেন্স ইনস্পেক্টরের ছদ্মবেশে ধানবাদের গোমো হয়ে দিল্লি, দিল্লি থেকে পেশোয়ার চলে গেলেন। পেশোয়ার থেকে অন্য ছদ্মবেশে চলে গেলেন আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল। কাবুলে অবস্থিত অবস্থিত ইতালীয় দূতাবাসের সহযোগিতায়, ইতালীয় দূতাবাসের এক কর্মী Orlando Mazzotta-র নামে পাসপোর্ট ভিসা বানিয়ে নিয়ে চলে গেলেন মস্কো, সেখান থেকে চলে গেলেন জার্মানির বার্লিনে। ১৯৪১ সালের ৩ এপ্রিল তিনি বার্লিন পৌঁছেছিলেন। অন্তর্ধান পর্বে অদ্ভুত, আশ্চর্য রোমাঞ্চকর ও বিপজ্জনক ছিল তাঁর ২ মাস ১৫ দিনের এই বিদেশ যাত্রা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে দুটি পক্ষের মধ্যে হয়েছিল তার একটি পক্ষ হলো অ্যাক্সিস পাওয়ার অর্থাৎ অক্ষ শক্তি; তাতে ছিল জার্মানি, ইতালি ও জাপান। অন্য পক্ষ হলো অ্যালাইড পাওয়ার অর্থাৎ মিত্র শক্তি, এতে ছিল— ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ও রাশিয়া।

সুভাষচন্দ্র জার্মানিতে যে উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছিলেন তা হলো ব্রিটিশের শত্রু হিটলারের সঙ্গে সরাসরি দেখা করে ভারতের মুক্তিযুদ্ধের যে পরিকল্পনা তিনি করেছেন তা হিটলারকে বোঝানো এবং ভারতের এই স্বাধীনতা যুদ্ধকে জার্মান সরকার যেন স্বীকৃতি দেয় এবং সেটা যেন ঘোষণা করে জার্মান সরকার, এই ব্যাপারটিকে নিশ্চিত করা। সুভাষচন্দ্রের কৌশল ছিল— কাঁটা দিয়ে কাঁটা সরানোর কৌশল অর্থাৎ অক্ষ শক্তির সাহায্যে লড়াই করে ব্রিটেনকে পরাজিত করে ভারতের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়া।

১৯৪২ সালের ৫ মে ইতালির রোমে গিয়ে মুসোলিনির সঙ্গে দেখা করেন সুভাষচন্দ্র। মুসোলিনি তাঁকে সাপোর্ট করবেন বলে আশ্বস্ত করেন। অবশেষে ১৯৪২ সালের ২৯ মে তিনি হিটলারের সঙ্গে মিটিং করতে সক্ষম হন। হিটলার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ সাহায্য করার ব্যাপারে আগ্রহী হলেন না; এবং সুভাষচন্দ্রকে অন্যান্য উপায়ে সাহায্য করতে রাজি থাকলেও ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে কোনো প্রকাশ্য বিবৃতি দিতেও রাজি হলেন না, যদিও এ ব্যাপারে মুসোলিনি হিটলারকে প্রকাশ্য বিবৃতি দিতে অনুরোধ করেছিলেন। তবে সুভাষ যদি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে গিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন তবে হিটলার সবরকম সাহায্য করবেন বলে কথা দিলেন।

সুভাষচন্দ্র এইসব কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বযুদ্ধের গতিপ্রকৃতিও অনুধাবন করে যাচ্ছিলেন। ১৯৪১ সালের ৮ ডিসেম্বর, অ্যাক্সিস পাওয়ারের আরেক শরিক জাপান ও ব্রিটেন— আমেরিকার

বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে জাপ বাহিনী তখন ব্রিটিশ বাহিনীকে তছনছ করে দিচ্ছিল। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সিঙ্গাপুরের পতন ঘটে। সুভাষচন্দ্র বার্লিনে অবস্থিত জাপানি দূতাবাসের জাপান সরকারের প্রতিনিধি ও জাপানে আত্মগোপন করে থাকা আরেক মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছিলেন। তিনি চিন্তা করলেন যুদ্ধের এই পরিস্থিতিতে, জার্মানিতে সময় নষ্ট না করে জাপানি সহায়তায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে লড়লে ভালো ফল পাওয়া যাবে। এদিকে জাপানে থেকে রাসবিহারী বসু পূর্ব এশিয়ার ছোটো ছোটো দেশগুলোতে যেসব ভারতীয়রা থাকতেন তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে তৈরি করেছিলেন 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ'। প্রায় ৩০ লক্ষ ভারতীয় 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে জাপ বাহিনীর হাতে বন্দি হয়েছিল ব্রিটিশ বাহিনীর প্রচুর সৈন্য। তাদের মধ্যে প্রচুর ভারতীয় সেনা ছিল। বিপ্লবী চিন্তানায়ক রাসবিহারী বসু জাপান সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এইসব ভারতীয় সৈন্যদের দেশপ্রেমে উদবুদ্ধ করে ক্যাপ্টেন মোহন সিংহের নেতৃত্বে তৈরি করেছিলেন 'আজাদ হিন্দ বাহিনী', যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত। এইরকম পরিস্থিতিতে ১৯৪২-এর মাঝামাঝি সময়ে সুভাষচন্দ্র যখন ঠিক করলেন তিনি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে আসবেন, তখন রাসবিহারী বসু চাইলেন সুভাষচন্দ্র যেন এসে 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ' এবং 'আজাদ হিন্দ বাহিনী' উভয়েই দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৪২ সালের জুন মাসে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে ব্যাংককে পূর্ব এশিয়ার 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ'-এর এক মহাসম্মেলন হয়। সেখান থেকে জাপান সরকারের সম্মতিতে সুভাষচন্দ্রকে আমন্ত্রণ করা হয় তিনি যেন পূর্ব এশিয়ায় এসে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সুভাষচন্দ্র রাজি হলেন।

বার্লিন ও রোমে অবস্থিত জাপান ও ইতালির দূতাবাসগুলিতে জাপান, জার্মানি ও ইতালি সরকারের সামরিক প্রতিনিধিদের দীর্ঘ গোপন শলাপরামর্শের মাধ্যমে ঠিক হলো কীভাবে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে শত্রু দেশের নজর এড়িয়ে সুভাষচন্দ্রকে গোপনে ও নিরাপদে এত দূর থেকে দক্ষিণ--- পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে নিয়ে আসা হবে। ঠিক হলো— নেতাজীকে জার্মান সাবমেরিনে করে ইংলিশ চ্যানেল, আটলান্টিক মহাসাগর পার করিয়ে, পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল হয়ে ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ আফ্রিকার উপকুল হয়ে মাদাগাস্কারের দক্ষিণে জাপানি সাবমেরিনে তুলে দেওয়া হবে এবং নেতাজী সঙ্গে একজন মাত্র বিশ্বস্ত ও উপযুক্ত সহযোগী নিতে পারবেন। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী নেতাজী সুভাষচন্দ্র ১৯৪৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি, কিয়েল বন্দর থেকে সহযোগী আবিদ হাসানকে সঙ্গে নিয়ে জার্মান সাবমেরিনে রওনা দিলেন। ভয়ানক বিপজ্জনক ছিল সেই যাত্রা। জাপান ও জার্মানির সামরিক অফিসাররাও সঙ্কিত ছিলেন নেতাজীর এই বিপদসংকুল যাত্রায়।

যাইহোক, দু' মাসেরও বেশি সময় নানারকম বিপদ অতিক্রম করে ২৮ এপ্রিল ১৯৪৩, মাদাগাস্কারের দক্ষিণে, জাপানের নৌ সীমানায় এসে পৌঁছলেন নেতাজী। সেদিন সমুদ্র ছিল ভয়ানক তরঙ্গবিক্ষুব্ধ। নেতাজী ও আবিদ হাসান জীবনের মায়া তুচ্ছ করে একটি বোটে করে বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে তবে জাপানি সাবমেরিনে উঠেন এবং জাপানি বেশে গিয়ে পৌঁছলেন।

সেখানে রাসবিহারী বসু নেতাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি নেতাজীকে 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ' ও 'আইএনএ'-এর দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন এবং জাপানি সামরিক বাহিনী ও জাপানি প্রধানমন্ত্রী তোজো সম্পর্কে অবহিত করেন। ১০ জুন জাপানি প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে নেতাজীর প্রথম মিটিং হয়। ১৬ জুন নেতাজী জাপান পার্লামেন্টে আমন্ত্রিত হন। সেখানে প্রধানমন্ত্রী তোজো প্রকাশ্যে নেতাজীকে ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে সামরিক সাহায্য-সহ সবরকম সাহায্য প্রদানের কথা ঘোষণা করেন।

১৯৪৩ সালের ২৭ জুন তিনি রাসবিহারী বসুর সঙ্গে সিঙ্গাপুর পৌঁছান। ৪ জুলাই, সিঙ্গাপুরের ক্যাথে সিনেমা হলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে বিভিন্ন ভাবে যুক্ত ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের প্রায় দু' হাজার আমন্ত্রিত সদস্যের উপস্থিতিতে রাসবিহারী বসু এক মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দিয়ে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে নেতাজীকে ওই পদ গ্রহণ করতে আহ্বান জানান। সবাই দাঁড়িয়ে উল্লাস ও করতালির মাধ্যমে তা সমর্থন করেন। পরদিন ৫ জুলাই, সিঙ্গাপুরের সমুদ্রতীরে টাউন হলের সামনে বিস্তীর্ণ ময়দানে আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রায় তেরো হাজার সৈনিক ও অফিসারদের সামনে নেতাজীকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তিনি সেই বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে বাহিনীর কুচকাওয়াজের অভিবাদন গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি আজাদ হিন্দ বাহিনীর জওয়ানদের উদ্দেশ্যে এক দীর্ঘ মর্মস্পর্শী ভাষণ দিয়েছিলেন এবং সমস্ত জওয়ানদের মন জয় করে নিয়েছিলেন। সেই ভাষণের দু' এক ছত্র, বাংলা করলে যা দাঁড়ায়, তা হলো— '...আপনাদের এই বলে আশ্বস্ত করছি যে, আমি অন্ধকারে বা আলোতে, দুঃখে বা সুখে, পরাজয়ের কষ্টে বা বিজয়ের উল্লাসে সবসময় আপনাদের সঙ্গে থাকবো। বর্তমান পরিস্থিতিতে, আমি আপনাদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, খাদ্য ও জরুরি জিনিসের অভাব, যুদ্ধ ও মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই দিতে পারবো না। জীবন মৃত্যুর এই লড়াইয়ে আপনারা যদি আমাকে অনুসরণ করেন, তবে আমি আপনাদের নিশ্চিত করে বলতে পারি যে জয় আমাদের হবেই, স্বাধীনতা আমাদের আসবেই। আমরা কতজন এই স্বাধীনতা উপভোগ করবার জন্য বেঁচে থাকবো সেটা বড়ো কথা নয়, দেশমাতার শৃঙ্খলা মোচনে আমারা যে আমাদের সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত সেটাই বড়ো কথা। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের লড়াইয়ে আশীর্বাদ করুন, এই কামনা করি'।

১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর পূর্ব এশিয়ার প্রায় ১০০০ জন ভারতীয় প্রতিনিধি

সিঙ্গাপুরে জমায়েত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে একটি Provisional Government তৈরি করা হবে এবং তাঁরা নেতাজীকে সেই সরকারের Chief Executive নির্বাচিত করলেন। ঠিক হলো নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু হবেন সেই সরকারের প্রধান।

অস্থায়ী স্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকারের গঠন ও কার্যপ্রণালী কীরকম হবে তা ব্যাখ্যা করে নেতজী সেখানে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তার অল্প কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি— ''—With the creation of the National Army it became possible as well as necessary to set up a Provisional Government of Azad Hind (Free India). The Govenment is born out of the Independence League for the purpose of Launching and directing the final stuggle for India's freedom. —the Provisional Government of Azad Hind will not be like a normal peace-time government. Its functions and its composition will be of unique kind. It will be a fighting organization, the main object of which will be to launch and to conduct the last war against the British and their allies in India.—The Cabinet will consist of certain number who will represent the civil departments of the Government, while there will be others representing the armed forces of the Government. Since the purpose of the Goverment is to fight for independence, the armed forces have been given a larger representation in the Cabinet. —When the Provisional Government is transferred to Indian soil, it will assume the functions of a normal government operating its own territory. Many new departments will then be formed."

অস্থায়ী স্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকারের দপ্তর বণ্টন নিম্নরূপ ছিল— অস্থায়ী স্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকারে (Provisional Government of Free India) রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডারও তিনিই নির্বাচিত হলেন। তিনি অন্যান্য যেসব দায়িত্ব পেয়েছিলেন তা হলো Minister of War, Minister for Foreign Affairs। Lt.Col A.C. Chatterjee পেলেন অর্থ দপ্তর, Mr. S.A. Ayer— প্রচার মন্ত্রক, Capt Miss Laxmi Swaminathan —রানি ঝাঁসি রেজিমেন্টের দায়িত্ব পেলেন। তাছাড়া ৮ জন সামরিক অফিসার মন্ত্রীসভায় আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিনিধি রূপে থাকলেন। তাঁরা হলেন— Lt. Col Aziz Ahmed, Lt. Col N.S. Bhagat, Lt. Col Gulzara Singh, Lt. Col. M.Z. Kiani, Lt. Col. A.D. Loganathan, Lt. Col. Ehsan Qadir, Lt. Col Shah Nawaz Khan, Col. J.K. Bhonsle.

আরও ৬ জন উপদেষ্টা হিসেবে থাকলেন। তাঁরা হলেন— Karim Gani, Debnath Das, D.M. Khan, A. Yellappa, J. Thivy, Sardar Ishar Singh. রাসবিহারী বসু হলেন প্রধান উপদেষ্টা, এ এন সরকার হলেন আইনি পরামর্শদাতা, আনন্দমোহন সহায় হলেন সচিব (with Ministerial Rank)। ভাবগম্ভীর পরিবেশ নেতাজী এবং অন্যান্যরা যখন শপথ বাক্য পাঠ করলেন তখন ভাবাবেগ ও উত্তেজনায় সভাঘরটি যেন ফেটে পড়লো।

আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের পরে কালবিলম্ব না করে জাপান সরকার তাকে স্বীকৃতি দিয়ে দিল। জার্মান সরকারও আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকৃতি দিতে দেরি করল না। কয়েক দিনের মধ্যেই আরও যে সব দেশ আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল তারা হলো--- রাশিয়া, ইতালি, বার্মা, থাইল্যান্ড, জাতীয়তাবাদী চীন, ইমনডি ভ্যালেরার নেতৃত্বাধীন আয়ারল্যান্ড, ফিলিপিন্স, ক্রোয়েশিয়া ও মাঞ্চুরিয়া। ওই দেশগুলিতে স্থাপিত হয়েছিল আজাদ হিন্দ সরকারের দূতাবাস, নেতাজীর ছবি সমেত ছাপা হয়েছিল আজাদ হিন্দ সরকারের কারেন্সি নোট।

আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করার পরের দিনই, সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী তথা সেই সরকারের যুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী তথা আজাদ হিন্দ বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ইংল্যান্ড ও আমেরিকার সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। আজাদ হিন্দ সরকারের পরামর্শদাতা মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসু এই যুদ্ধকে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতাকামীদের 'শেষ ও মোক্ষম যুদ্ধ (The Last and the best Fight), বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখলে বলতে হবে— 'আজাদ হিন্দ সরকার'ই হলো অখণ্ড ভারতের প্রথম স্বাধীন সরকার। আর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী। সুতরাং নেতাজী সুভাষ ছিলেন অখণ্ড ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবরের যে অপরিসীম গুরুত্ব তা কি এই দিনটিকে দেওয়া হয়েছে? অবশ্য কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বর্তমান সরকার সেই স্বীকৃতি দিয়েছে। পরিতাপের বিষয় হলো যে ১৯৪৭ পরবর্তী পর্যায়ে ভারতে স্বার্থান্বেষী রাজনীতির রমরমা হওয়ায় নেতাজীকে যথার্থ সম্মান জানাতে ব্যর্থ হয়েছে এই দেশ।

**তথ্যসূত্র :**


১. স্বাধীনতার যুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজ— শিশিরকুমার বসু।

২. A Beacon Across Asia—S.K.Bose, A Werth, S.A.Ayer.

৩. Bose An Indian Samurai—Maj Gen (Dr.) GD Bakshi, VSM (retd).

৪. Bose or Gandhi Who Got India Her Freedom---Maj Gen (Dr.) GD Bakshi, VSM (retd).

৫. Revolutionaries---by Sanjeev Sanyal.

৬. Satyameva Jayate---by Abhijit joag.

৭. মৃত্যুঞ্জয়ী সুভাষ সমগ্র— ড. অলক কুমার সেন।

৮. নেতাজী উপেক্ষিত কেন— অমিতাভ দত্ত।